Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

# নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম জামান

রোলঃ 228020043


২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাসনিম জামান

রোলঃ 228020043

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাসনিম জামান, আইডিঃ 228020043 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাসনিম জামান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

**তাসনিম জামান**

আইডিঃ 228020043

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

# সূচিপত্র

ভূমিকা....................5
নামায বা সালাতের পরিচয় ....................7
নামায বা সালাতের সংজ্ঞা ....................7
নামাযের প্রকার ....................10
নামাযের সময় ....................10
নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি ....................20
নামাযের রুকনসমূহ....................22
নামাযের ওয়াজিবসমূহ ....................24
নামাযের সুন্নতসমূহ....................27
নামায ভঙ্গের কারণসমূহ ....................30
নামাযের মাকরূহসমূহ....................32
ইসলামে নামাযের গুরুত্ব ....................33
নামাযের সামাজিক গুরুত্ব....................44
নামাযের ফযীলত ....................46
নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব ....................49
নামাযে খুশূ-খুযু হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয় ....................51
নামায ছেড়ে দেয়ার পরিণতি....................52
নেফাকিপূর্ণ নামায....................54
নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায ....................56
সাহাবায়ে কেরামের নামায....................61
সালাফদের নামায ....................64
শেষকথা....................66

# ভূমিকা

কালিমায়ে শাহাদাতের পর নামায ইসলামের দ্বিতীয় রুকুন। কালিমার পরেই নামাযের স্থান। একজন মানুষ ঈমান আনার পর ওপর প্রথম যা ফরজ হয়ে পড়ে, তা হলো পাঁচ ওয়াক্ত নামায। কুরআনুল কারিমে নামাযের ব্যাপারে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মুমিনের জীবনে শ্রেষ্ঠ উপহার হলো নামায। বান্দার সাথে তার রবের সম্পর্ক দৃঢ় এবং মজবুত হয় পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মাধ্যমে। নামায আদায়ের মাধ্যমে একজন বান্দা তার রবের সাথে সর্বদা সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে এবং এটি বান্দাকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। একজন মু'মিনের জীবনে নামায হলো ঢালস্বরূপ। নামায সকল প্রকার গুনাহ থেকে বিরত রাখে। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ

নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। [সূরা আনকাবূত: ৪৫]

নামায এমন একটি বর্ম-যা একজন মু'মিনকে অশ্লীলতা, পাপাচার, অনাচার থেকে দূরে রাখে। নামায হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত এবং খুশূ হচ্ছে নামাযের প্রাণ এবং সৌন্দর্য। খুশূ-খুযুর সাথে নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার অন্তর প্রশান্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষ এবং জীন জাতিকে তাঁর ইবাদাত এবং আনুগত্য করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কুরআন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْن

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। [ সূরা আয যারিয়াত: ৫৬]

হিজরতের পূর্বে নবুওয়াতের ১২ অথবা ১৩তম বছরে শবে-মি'রাজে সপ্ত আসমানের উপরে সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূলের সাক্ষাতে (বিনা মাধ্যমে) নামায ফরজ হয়। প্রত্যহ্ ৫০ ওয়াক্তের নামায ফরজ হলে হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত জিবরীল (আঃ) এর পরামর্শমতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নিকট কয়েকবার যাতায়াত করে নামায হালকা

করার দরখাস্ত পেশ করলে ৫০ থেকে ৫ ওয়াক্তে কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু আল্লাহর কথা অনড় বলেই ঐ ৫ ওয়াক্তের বিনিময়ে ৫০ ওয়াক্তেরই সওয়াব নামাযীরা লাভ করে থাকেন। [বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৮৬৪নং]

নামায ফরজ হওয়ার গোড়াতে (৪ রাকআতবিশিষ্ট নামাযগুলো) দু' দু' রাকআত করেই ফরজ ছিল। পরে যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্বীনায় হিজরত করলেন, তখন (যোহর, আসর ও এশার নামাযে) ২ রাকআত করে বেড়ে ৪ রাকআত হল। আর সফরের নামায হল ঐ প্রথম ফরমানের মোতাবেক। [বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ১৩৪৮ নং]

নামায একটি ফরজ তথা আবশ্যক ইবাদত। সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে হৃদয়কে উজ্জীবিত রাখার উপায় হিসেবে তাঁর বান্দাদের জন্য নামাযের নির্দেশ দিয়েছেন।
আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন-

اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝

‘নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং আমার ইবাদাত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর’। [সূরা ত্বহা: ১৪]

নামাযের আবশ্যকতার তাকিদ দিয়ে কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন -

فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।
[সূরা মুজাদালা: ১৩]

## নামায বা সালাতের পরিচয়

‘সালাত' আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ হলো,

الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار

দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত, ইত্যাদি। [লিসানুল আরব/ আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব, পৃ: ১৬৮১, বই: ফিকহুস সালাত]

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۖ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ। [ সূরা তাওবা: ১০৩]

## নামায বা সালাতের সংজ্ঞা

**সালাতের পারিভাষিক অর্থ**-

وفي الشرع أقوال وأفعال تفتيح بالتكبير وتختتم بالتسليم بشرائط مخصوصة

'কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা (রুকু-সিজদা সহকারে) নির্ধারিত শর্তাবলি সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত; সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।

[আল ফিকহুল মুয়াসসার: ৯৯, বই: ফিকহুস সালাত]

এটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত ফরজ হওয়া কুরআন, সুন্নাহ্ ও মুসলমানদের ইজমা (বা ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত; এ জন্য কোন মুসলিম যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের (মুরতাদ) ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হিসাবে বিবেচিত।

**কুরআন ও হাদীসে নামায**

**ফজর-মাগরীব**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ۚ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ذٰلِكَ ذِكْرٰي لِلذّٰكِرِيْنَ ۚ

আর তুমি সালাত কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম অংশে। নিশ্চয়ই ভালকাজ মন্দকাজকে মিটিয়ে দেয়। এটি উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য উপদেশ। [সূরা হুদ: ১১৪]

**যোহর-আসর**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

حفِظُوا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلَوٰةِ الْوُسْطَى

তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের। [সূরা বাকারাহ: ২৩৮]

**এশা**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰي غَسَقِ الَّيْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ ۭ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا

সূর্য হেলে পড়ার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম কর এবং ফজরের কুরআন(সালাত)। নিশ্চয় ফজরের কুরআন (ফেরেশতাদের) উপস্থিতির সময়। [সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৮]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ

অতএব তোমরা আল্লাহর তাসবীহ কর, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং সকালে উঠবে। [সূরা রুম: ১৭]

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ

আর অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমান ও যমীনে সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁরই। [সূরা রুম: ১৮]

সূরা রূমের উক্ত আয়াতে একই সাথে ৫ ওয়াক্ত সালাতের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম যে সালাত একথা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। [তাফসীরে রুহুল মাআনী-৮/২৯, মাআরিফুল কুরআন-৬ খন্ড, ২১ পারা, পৃষ্ঠা- ৪০, বই: ফিকহুস সালাত]

**হাদীসে নামায**

ক. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল-এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা। [সহীহ বুখারী: ০৮; সহীহ মুসলিম: ১৬; বই: ফিকহুস সালাত]

খ. তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমাতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُنَّ قَالَ " لاَ إِلا أَنْ تَطَوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُ فَقَالَ " لاَ إِلا أَنْ تَطَّوَّع َ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত' সে বলল, এ ছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে পার। [সহীহ মুসলিম: ৪]

গ. নামায হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপ মোচনের নদী: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرنِهِ شَيْءٌ؟»
قَالُوا: لا يبقى من درنه شيء، قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

মনে কর তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে, এতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? তারা বললেন: জি না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন: এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেন। [সহীহ বুখারী: ৫২৮; সহীহ মুসলিম: ৬৬৭]

ঘ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথেই নিভৃতে আলাপ করো। [সহীহ বুখারী: ৩৯০]

৩. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো এরশাদ করেন,

بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْكُفْرِ والشرك ترك الصلاة

ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া। [মুসলিম, বই: ফিকহুস সালাত]

## নামাযের প্রকার

নামায দুই প্রকার।

১। রুকু-সিজদাবিশিষ্ট নামায:

ক .ফরজ (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায)।

খ. ওয়াজিব যথা বিতির, দুই ঈদের নামায, নফলের কাযা, তাওয়াফের পর দুই রাকাআত নামায।

গ. নফল; ফরয, ওয়াজিব ব্যতীত সকল নামায।

২। রুকু-সিজদাবিহীন নামায: জানাযার নামায

## নামাযের সময়

ক. নিষিদ্ধ সময়

খ. মাকরূহ সময়

গ. নামাযের মূল সময়

ঘ. নামাযের মুস্তাহাব সময়

**নামাযের নিষিদ্ধ সময়**

ক. সূর্যোদয়ের সময়।
খ. সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে।
গ. সূর্য যখন অস্ত যায়।

এই তিন সময়ে নামায পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত হয়েছে। উকবা বিন আমের জুহানী রাযি. বলেন,

ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ موتانا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضيف الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

“তিনটি সময়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়, যতোক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। যখন সূর্য অস্ত যায়।” [সহীহ মুসলিম: ১৩৭৩, বই: ফিকহুস সালাত]

বি.দ্র.-
যেহেতু সূর্যের উদয় ও অস্ত সব সময় একই সময়ে হয় না, সেহেতু ঘড়ির সময় অনুপাতে তা বর্ণনা করা এই পরিসরে কঠিন। তাই, এর জন্য স্থায়ী ক্যালেন্ডারের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।
সূর্যোদয়ের সময়; যতক্ষণ না তার হলুদ রঙ ভালোভাবে চলে যায়, আলো ভালোভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্য আনুমানিক ১৫-২০ মিনিট সময় প্রয়োজন হয়।

**খ. (নফল) নামাযের মাকরূহ সময়**

১. (ফজরের সুন্নাত ছাড়া) সুবহে সাদিক থেকে ফজরের ফরজ পর্যন্ত।
২. ফজরের ফরজ থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।
৩. আসরের ফরজের পর থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত।
৪. মাগরিবের আযান থেকে মাগরিবের ফরজ সালাত পর্যন্ত।
৫. জুমা-ঈদে খুতবা চলাকালীন থেকে ফরয সালাত পর্যন্ত।
৬. ইকামাতের সময়।

৭. ইদের নামাযের আগে ও পরে ইদগাহতে পড়া।

৮. আরাফা এবং মুযদালিফায় উভয় ফরজ নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে।

৯. ক্ষুধা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা নিয়ে।

১০. প্রস্রাব-পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে।

১১. নামায থেকে বিমুখকারী এবং খুশূ-খুযুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বস্তুর উপস্থিতিতে।

## সুবহে সাদিকের পর ফজরের ফরজ সালাতের আগে দুই রাকাআত-

সুন্নাত ছাড়া অন্য নফল সালাত পড়া মাকরুহ। চাই তা ঘরে পড়া হোক কিংবা মসজিদে। অতএব ফজরের ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর তাহিয়্যাতুল অজু' বা দুখুলুল মসজিদ পড়া অনুচিত। তবে ফজরের সুন্নতের সাথে তাহিয়্যাতুল অজু ও দুখুলুল মসজিদ সালাতের নিয়ত করে নিলে তার সওয়াব পেয়ে যাবে ইন শা আল্লাহ।
(অজু করার পর অজুর অঙ্গগুলো শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামায পড়া মোস্তাহাব। ইসলামী পরিভাষায় এই সালাতকে তাহিয়্যাতুল অজু বলে।) এবং জামাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বাকি সময় তাসবীহ-তাহলীল, দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়া।

হযরত হাফসা রাঃ থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يُصَلَّى إلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن وفي رواية إلا ركعتي الفجر

“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন সালাত পড়তেন না।”
[সহীহ মুসলিম: ১৭১১, সহিহ বুখারি: ১১৭৩, বই: ফিকহুস সালাত]

ইমাম তিরমিযী রাহি, বলেন,

وهو ما أجمع عليه أهل العلم، كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

“আহলুল ইলম একমত যে, কোনো ফজরের সময় হওয়ার পর থেকে সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সময়ে ফজরের দুই রাকাআত সুন্নাত ছাড়া অতিরিক্ত নফল পড়াকে মাকরুহ মনে করেন।”
[তিরমিজি: ৭৫, বই: ফিকহুস সালাত]

**ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নফল সালাত পড়া মাকরূহ।**

**আসরের সালাতের পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন সালাত পড়া মাকরূহ।**

আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلا صَلاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

"ফজরের সালাতের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোনো সালাত নেই। আসরের সালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সালাত নেই।" [সহীহ বুখারী: ৫৫১, বই: ফিকহুস সালাত]

বি.দ্র.- পূর্বের প্রত্যেকটি মাকরূহ সময়ে (ফজর থেকে ফজরের সালাত এবং ফজরের সালাত থেকে সূর্যোদয় এবং আসর থেকে মাগরিব) কাযা সালাত, জানাযার সালাত এবং সিজদায়ে তেলাওয়াত আদায় করা মাকরূহ নয়।
[ফিকহুল ইবাদাহ লিল হালাবী]

কেউ যদি ওই দিনের আসরের সালাত সঠিক সময়ে পড়তে না পারে তাহলে সূর্যাস্তের আগে হলেও তা পড়ে নিতে হবে। কাযা করা যাবে না। কারণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العصر قبل أن تغربَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

"যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের সালাতের এক রাকাআত পেল সে আসরের সালাত পেল।" [নাসায়ী: ৫১৮, বই: ফিকহুস সালাত]

**মাগরিবের সালাতের আযানের পর থেকে মাগরিবের সালাত পড়ার পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরূহ।**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

بين أَذَانَيْنِ صَلاةٌ إِلَّا الْمُغَرِبَ

"প্রতিটি দুই আযান (আযান ও ইকামাত) এর মাঝে (নফল) সালাত আছে মাগরিব সালাত ছাড়া।" [বায়হাকী ৪১৭২]

প্রত্যেক সালাতের আযান ও ইকামতে মাঝামাঝি সময়ে দুই রাকাআত সালাত পড়া নফল। আবশ্যক নয়। শুধু মাগরিব সালাতের ক্ষেত্রে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাৎ মাগরীবের আযান দিলে ফরজের আগে অন্য কোন সালাত নেই। হযরত তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাঃ কে প্রশ্ন করা হল, মাগরিবের (ফরজের আগে ও আজানের পর) আগে কোন সালাত আছে কি? তিনি বললেন,

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا

আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত কাউকে এ সময় সালাত পড়তে দেখিনি। [আবু দাউদ: ১২৮৪, বই: ফিকহুস সালাত]

উল্লেখ্য, এটি হচ্ছে ফিকহে হানাফী অনুযায়ী সালাতের হুকুম। তবে অন্যান্য ফিকহী মাযহাবে এ সময়ে সালাতের সুযোগ রয়েছে।

**ইমাম যখন জুমআ-ঈদের খুতবার জন্য বের হন, তখন থেকে ফরজ সালাত থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত নফল সালাত পড়া মাকরুহ।**

ক. হযরত নুবাইশা হুজালী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে,

أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُؤْذِي أَحَدًا فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْإِمَامَ خَرَجَ صَلَّى مَا بَدَا لَهُ وَإِنْ وَجَدَ الْإِمَامَ قَدْ خَرَجَ جَلَسَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ جُمُعَتَهُ وَكَلامَهُ إِنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي جُمْعَتِهِ تِلْكَ ذُنُوبُهُ كُلُّهَا أَنْ تَكُونَ كَفَّارَةً لِلْجُمْعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا

“যখন কোন মুসলমান জুমআর দিন গোসল করে অতঃপর মসজিদে আসে এবং কাউকে কষ্ট না দিয়ে ইমাম সাহেব খুৎবার জন্য বের না হয়ে থাকলে যতটুকু সম্ভব সালাত পড়ে। আর ইমাম সাহেব বের হয়ে গিয়ে থাকলে বসে পড়ে এবং ইমাম সাহেব খুৎবা ও জুমআ শেষ না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনে এবং চুপ থাকে; তাহলে যদি এ জুমআয় তার সকল গুনাহ মাফ নাও হয় তবে পূর্ববর্তী জুমআ পর্যন্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে।” [মুসনাদে আহমাদ: ২০৭২১]

খ. হযরত উরওয়াহ (রা.) বলেন,

إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةَ

“ইমাম মিম্বারে বসলে কেউ কোন সালাত পড়বে না।” [ইবনে আবী শাইবা: ৫২১৩]

**ইকামাতের সময়। সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়।**

আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

“যখন সালাত শুরু হয়, তখন ফরজ সালাত ছাড়া আর কোন সালাত পড়া জায়েজ নয়।” [তিরমিজি: ৪২১]

বি.দ্র.- তবে ফজরের সুন্নতের অত্যধিক গুরুত্বের কারণে ইকামাতের পরও মসজিদের কোনো কোণে তা আদায় করতে বলা হয়েছে, যদি দ্বিতীয় রাকাআত পাওয়া যাওয়ার পুরোপুরি সম্ভাবনা থাকে।

বহু সংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী এমন ছিলেন, যারা কখনো যদি মসজিদে এসে দেখতেন যে, ফজরের ইকামাত বা জামাত শুরু হয়ে গেছে, তাহলে মসজিদের ভেতরে জামাতের কাতার থেকে দূরে বারান্দায় বা মসজিদের এক প্রান্তে কিংবা খুঁটির আড়ালে ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত পড়ে নিতেন। তারপর জামাতে শরীক হতেন। আর কিছুসংখ্যক সাহাবী-তাবেয়ী মসজিদের ভেতরে তা পড়তেন না। তবে মসজিদের বাইরে ঘরে বা পথে অথবা মসজিদের দরজায় পড়তেন। তারপর ইমামের সাথে শরীক হতেন।

ক. আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত, (কুফার গভর্নর) সায়ীদ ইবনে আস তাঁকে এবং হুযায়ফা ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-কে ফজরের সালাতের আগে ডাকলেন। তাঁরা (কাজ শেষে) তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

ثم خرجوا من عنده وقد أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله إلى أسطوانة من المسجد، فصلى الركعتين، ثم دخل في الصلاة

“ইতিমধ্যে মসজিদে ফজরের সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেছে। ইবনে মাসউদ রা. মসজিদের একটি খুঁটির আড়ালে ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন।” [শরহু মাআনিল আসার ১/৬১৯]

খ. আবু মিজলায থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ফজরের জামাত চলা অবস্থায় ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.-এর সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলাম। ইবনে উমর রা. জামাতের কাতারে প্রবেশ করলেন। আর ইবনে আব্বাস রা. ফজরের দুই রাকাআত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর জামাতে শরীক হলেন।

উল্লেখ্য- কতিপয় সাহাবী-তাবেয়ী إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (সালাতের ইকামাত শুরু হয়ে গেলে ফরজ ছাড়া অন্য সালাত পড়া জায়েয নয়)-এই হাদীসের ওপর ভিত্তি করে ইকামাত বা জামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়তেন না। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আবু হুরায়রা রা., আবু মূসা আশয়ারী রা.,মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাসীর রাহি, তাঁরা إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة এই হাদীসের বিধানকে সকল সালাত এমনকি ফজরের সুন্নতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য মনে করতেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবী-তাবেয়ী ফজরের সুন্নাত অধিক গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ হওয়ায় এই বিধান থেকে একে ভিন্ন মনে করতেন। হাদীসটিকে তাঁরা ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্যান্য সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করতেন। ফজরের সুন্নতের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাগিদ এবং আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত বিভিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনা থেকেও এটাই প্রতীয়মান হয়। কোনো কোনো সাহাবী নবীজীর সামনে ফজরের ইকামাত চলাকালে মসজিদে সুন্নাত পড়েছেন। এ ক্ষেত্রে নবীজী তাঁদেরকে সরাসরি নিষেধ করেননি বা এ কথা বলেননি যে, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (ফরজের ইকামাত শুরু হলে অন্য সালাত পড়া নিষেধ) বরং তিনি বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করেছেন। যদি ইকামাত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়া সর্বাবস্থায় নাজায়েয হত, তাহলে তিনি স্পষ্ট নিষেধ করতেন বা বলতেন যে, ফরজের ইকামাত শুরু হলে অন্য সালাত পড়া নিষেধ।

বি.দ্র.- সময় যদি এত কম হয় যে সুন্নাত পড়তে গেলে ফরজ সালাত শেষ হয়ে যাবে, তাহলে সুন্নাত পড়া মাকরুহ।

عند ضيق الوقت خوفاً من تفويت الفرض أو تأخيره

**ঈদের সালাতের আগে নফল সালাত পড়া এবং পরে [ইদগাহে] পড়া মাকরুহ।**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্বরের দিন বের হলেন এবং দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। এর পূর্বে ও পরে কোন সালাত আদায় করেননি। [সহীহ মুসলিম: ১৯৪৪]

**আরাফার ময়দানে, বিশেষ করে হজযাত্রীদের জন্য যোহর আর**
**আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত পড়া মাকরুহ। মুজদালিফায় বিশেষ করে হজ যাত্রীদের জন্য মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে।**

জাফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে তার পিতার সূত্র থেকে বর্ণনা করেন যে,

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফাহর ময়দানে এক আযান ও দুই ইকামতে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু এ দুই সালাতের মধ্যখানে কোনো [সালাত] তাসবীহ পড়েননি। অনুরূপভাবে তিনি মুযদালিফায় এক আযান ও দুই ইকামাতে মাগরিব ও এশার সালাত আদায় করেছেন এবং দুই সালাতের মাঝখানে কোন তাসবীহ [সালাত] পড়েননি। [আবু দাউদ: ১৯০৬]

**খুব ক্ষুধা এবং খানার প্রতি তীব্র চাহিদা হলে ওই অবস্থায় নফল সালাত পড়া মাকরুহ। কেননা এর ফলে খাবারের সঙ্গেই মন লেগে থাকবে; সালাতের সঙ্গে নয়।** [সহীহ মুসলিম :৮৬৯]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان

“খানার উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই।” [সহিহ মুসলিম: ৫৬০]

সুতরাং যখন খানা তৈরী হয়ে যায় এবং সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন আগে খানা খেয়ে নেয়া। কারণ, এমতাবস্থায় সালাতে একাগ্রতা আসে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب

“যখন রাতের খাবার উপস্থিত হয়ে যায়, তখন মাগরিবের আগে খানা খেয়ে নাও। [খানা শেষ করতে] তাড়াহুড়ো করো না।” [বুখারী: ৬৭২]

**প্রস্রাব-পায়খানা ও বায়ুর চাপ নিয়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ।**

আব্দুল্লাহ ইবনে আল-আরকাম সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি (উরওয়া) বলেন, একদা সালাতের ইকামাত হয়ে গেলো। তিনি (আব্দুল্লাহ) এক ব্যক্তির হাত ধরে তাকে সামনে ঠেলে দিলেন। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে আরকাম) স্বীয় গোত্রে ইমাম ছিলেন (সালাত শেষে) তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি-

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

“সালাতের ইকামাত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদের কারো মলত্যাগের প্রয়োজন হলে প্রথমে সে মলত্যাগ করে নেবে।” [তিরমিজি: ১৪২]

**এমন কোনো বস্তুর উপস্থিতিতে, যে বস্তু সালাত থেকে বিমুখকারী এবং খুশূ-খুযুতে ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী।**

সালাতের একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে এমন কারুকার্য খচিত, লেখা ও ক্যালিগ্রাফি সম্বলিত, রঙ্গিন ও ছবিযুক্ত কাপড় পরিধান না করা।

আয়শা (রা.) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কার্পেটে সালাত আদায় করার সময় তার কারুকার্যের প্রতি নজর পড়ে। সালাত শেষ করে বলেন, এ কার্পেটটি আবু জাহাম ইবনে হুযায়ফার নিকট নিয়ে যাও, আমার জন্য একটি আনজাবিয়া তথা, কারুকার্যহীন কাপড় নিয়ে আসো। এ কার্পেটটি সালাতের ভেতর আমাকে অন্যমনস্ক করে দিয়েছে। [সহিহ মুসলিম: ৫৫৬, বই: ফিকহুস সালাত]

**নামাযের সময় নির্ধারণ করার জন্য জিবরাইল (আ.) এর ইমামত সংক্রান্ত হাদিস**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন,

أمني جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظهر في الأولى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مثْلَ ظِلِهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ

الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ على الصائم

وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ . وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ

জিবরাইল (আঃ) কা'বা শরীফের চত্বরে দু'বার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন। তিনি প্রথমবার যোহরের সালাত আদায় করালেন যখন প্রতিটি জিনিসের ছায়া জুতার ফিতার মত ছিল। অতঃপর তিনি আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান ছিল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন যখন সূর্য ডুবে গেল এবং যে সময়ে রোযাদার ইফতার করে। অতঃপর এশার সালাত আদায় করালেন যখন লাল বর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। অতঃপর ফজরের সালাত আদায় করালেন যখন ভোর বিদ্যুৎ'র মত আলোকিত হল এবং যে সময় রোযাদারের ওপর পানাহার হারাম হয়।

তিনি (জিবরাইল) দ্বিতীয় দিন যোহরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার সমান হল এবং পূর্ববর্তী দিন ঠিক যে সময় আসরের সালাত আদায় করেছিলেন।

অতঃপর আসরের সালাত আদায় করালেন যখন কোন বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। অতঃপর মাগরিবের সালাত আদায় করালেন পূর্বের দিনের সময়ে।
অতঃপর এশার সালাত আদায় করালেন যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে গেল এবং ফজরের সালাত আদায় করালেন যখন যমিন আলোকিত হয়ে গেল। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হল আপনার পূর্ববর্তী নবীদের (সালাতের) ওয়াক্ত। সালাতের ওয়াক্ত এই দুই সীমার মাঝখানে। [তিরমিজি: ১৪৯, বই: ফিকহুস সালাত]

# নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলি

নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্ত ৭টি। যথা-

১. নিয়ত করা। নামায আদায়কারীকে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট নামাযের কথা পূর্ব থেকেই মনে মনে স্থির করতে হয়। কেননা হাদীসে এসেছে,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

নিশ্চয়ই আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। [আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৬. হাদীস: ১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত]

২. শরীর পাক। আলাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَي الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَي الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَي الْكَعْبَيْنِ ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۭ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓي اَوْ عَلٰي سَفَرٍ اَوْ جَاۗءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَاۗىِٕطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاۗءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاۗءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ۭ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দন্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর)। আর যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রী সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসেহ কর। আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তার নিআমত তোমাদের উপর পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। [সূরা মায়িদা: ৬]

৩. কাপড় পাক। যে কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া জরুরি। আলাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

আর তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র কর। [সূরা মুদ্দাসসির: ৪]

৪. নামাযের জায়গা পাক। যে স্থানে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তা পবিত্র হওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ، وَلَا الْقَذَرِ

নিশ্চয় মসজিদ গুলোতে পেশাব-পায়খানা করা কোনো ক্রমেই সঙ্গত নয়। [সহীহ মুসলিম: ৪২৯]

৫. সতর ঢাকা। সতর ঢাকার পরিমাণ হলো, পুরুষের জন্য নাভি থেকে উভয় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত আর মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ ব্যতীত সমস্থ শরীর।

৬. কেবলামুখী হওয়া। কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায আদায় করা। কেননা আলাহ পাক বলেন,

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

আর তুমি যেখান থেকেই বের হও, তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাক, তার দিকে তোমাদের চেহারা ফিরাও। [সূরা বাকারা: ১৫০]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة

যখন তুমি সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হও, পরিপূর্ণরূপে অযু কর অতঃপর কিবলা মুখী হও। [সহীহ বুখারী: ৭৯৩; সহীহ মুসলিম: ৩৯৭]

৭. নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা। শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায আদায় করা। এ সম্পর্কে আলাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَوْقُوتًا

নিশ্চয় নামায মুসলমানদের ওপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। [সূরা নিসা: ১০৩]

## নামাযের রুকনসমূহ

১. দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলা। অর্থাৎ নামাযকে الله أكبر বলে শুরু করা আবশ্যক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إذا قمت إلى الصلاة فكبر

যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াও, তাকবীর বল। [সহীহ বুখারী: ৭৯৩; সহীহ মুসলিম: ৩৯৭]

২. কিয়াম করা বা দাঁড়ানো

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُومُوا لِلَّهِ قَٰنِتِينَ

এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। [সূরা বাকারা: ২৩৮]

৩. কেরাআত পাঠ করা। ফরজ নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে এবং অন্যান্য নামাযের সকল রাকাআতে সূরা আল ফাতিহার সাথে পবিত্র কুরআনের যে কোন সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। [সূরা মুযাম্মিল: ২০]

৪. রুকু করা
আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَوٰةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّٰكِعِينَ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। [সূরা বাকারা: ৪৩]

এতটুকু ঝুঁকা যাতে হাত বাড়ালে হাত উভয় হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এটা রুকুর নিম্নতম পর্যায়। [রদ্দুল মুহতার ২/১৬৬, বই: ফিকহুস সালাত]

৫. সিজদা করা

يَأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। [সূরা হজ্জ: ৭৭]

৬. তাশাহুদ পরিমাণ শেষ বৈঠক।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ثُمَّ اجْلِسْ فَاطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ قُمْ فَإِذا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ

অতঃপর ধীর স্থিরভাবে উঠে বসবে। পরে উঠে দাঁড়াবে। এইরূপ করতে পারলে তবে তোমার সালাত পূর্ণ হবে।

অর্থাৎ সালাতের রাকাআত সমুহ সম্পূর্ণ করার পর সম্পূর্ণ তাশাহহুদ অর্থাৎ (আত তাহিয়্যাত) পর্যন্ত পড়তে যত সময় লাগে এতক্ষণ পর্যন্ত বসা ফরয। [আলমগিরী ১/৭০, বই: ফিকহুস সালাত]

## নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের মধ্যে কিছু বিষয় আছে অবশ্য করণীয়। তবে তা ফরজ নয়, আবার সুন্নাতও নয়। ফরজ [রুকন] এর পরেই ওয়াজিব এর স্থান, যা আবশ্যক। যা ইচ্ছাকৃতভাবে তরক (বাদ) করলে নামায বাতিল হয়ে যায় এবং ভুলক্রমে ত্যাগ করলে সিজদায়ে সাহু দিতে হয়।

১. তাকবীরে তাহরীমা সম্পৃক্ত ওয়াজিব

তাকবীরে তাহরীমায় 'আল্লাহু আকবার' বলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

সালাতের শুরু হলো তাকবীর, আর শেষ হলো সালাম। [সুনান আবু দাউদ: ৬১; সুনান তিরমিজি: ৩,২৩৮]

২. সালাতের প্রতি রাকাআতে সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ

অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। [সূরা মুযাম্মিল: ২০]

হাদীসে এসেছে,

لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

যে ব্যক্তি সূরা আল-ফাতিহা পড়ে না, তার সালাত হয় না। [সহীহ বুখারী: ৭৫৬; সহীহ মুসলিম: ৩৯৪]

৩. সূরা আল-ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো। ফরজ সালাত সমূহের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে যেকোনো সূরা বা আয়াত মিলিয়ে পড়া কমপক্ষে বড় এক আয়াত বা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা আবশ্যক। আলাহ তা''আলা বলেন,

فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

কাজেই কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। [সূরা মুযাম্মিল: ২০]

৪. সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার আগে পড়া। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় এভাবে নামায পড়তেন। কখনো এর ব্যতিক্রম করেননি তাই এটি ওয়াজিব। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فافتتحوا بِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين َ

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এবং আবু বকর ও উমর (রাঃ)-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সালাত আরম্ভ করতেন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'' দ্বারা। [নাসায়ী: ৯০৩, বই: ফিকহুস সালাত]

৫. ফরজ নামাযের প্রথম দুই রাকাআতকে কিরাতের জন্য নির্ধারিত করা। আবূ ক্বাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأولى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যোহর ও আসর সালাতের প্রথম দু রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দুটি সূরা পাঠ করতেন। তিনি কোন কোন সময় আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি যোহর সালাতের প্রথম রাকাআত কিছুটা দীর্ঘ করতেন এবং ২য় রাকাআত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফজর সালাতও অনুরূপ করতেন। [সহিহ বুখারী: ৭৭৬, মুসলিম: ৪৫১, আবু দাউদ: ৭৯৮]

৬. উচ্চঃস্বরে প্রকাশ্য/চুপিসারে কিরাআত পাঠ করা।

৭. দুয়া কুনুত পাঠ করা। বিতিরের সালাতে তৃতীয় রাক'আতে কিরাআতের পর দুআ কুনুত পাঠ করা ওয়াজিব। উবাই ইবনে কা'ব (রা.) সূত্রে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতির সালাতে রুকূ'র আগে কুনূত পাঠ করেছেন। [আবু দাউদ: ১৪২৭]

৮. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ রুকু শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ রুকু শেষে সিজদা করার পূর্বে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالْإِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ

আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তাঁর সালাত আদায় করার নিয়ম কানুন ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। তাঁর দাঁড়ানো (কিয়াম) তাঁর রুকু এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, তাঁর সিজদাহ্ এবং দু সিজদার মাঝে তাঁর বসা, অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় সিজদাহ, তাঁর সালাম ফিরানো, এবং সালাম ও সালাত শেষ করে চলে যাওয়ার মাঝখানে বসা-এর সবই প্রায় সমান (ব্যবধান) পেয়েছি। [সহিহ মুসলিম: ৯৪৪]

৯. সিজদা থেকে সোজা হয়ে বসা। দু সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা ওয়াজিব।

১০. আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। সালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা ওয়াজিব।

১১. সালাম বলা। নামায শেষে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ বলে নামায শেষ করা।

## নিম্নোক্ত ওয়াজিবগুলি সম্পূর্ণ নামায জুড়েই প্রযোজ্য

১. তারতীব ঠিক রাখা। প্রত্যেক রাকাআতের তারতীব বা ধারাবাহীকতা ঠিক রাখা অর্থাৎ আগের কাজ পেছনে এবং পেছনের কাজ আগে না করা।

২. তাদীলে আরকান বা ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করা। সালাতের সব কাজ ধীরে সুস্থে করতে হবে। যেমন রুকু ও সিজদা নিশ্চিত ও প্রশান্ত মনে তাড়াহুড়া না করে ভালোভাবে আস্তে আস্তে আদায় করা (ফিক্বহে হানাফী অনুযায়ী) ওয়াজিব।

## নামাযের সুন্নতসমূহ

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা না ঝুঁকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

২. তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হাত উত্তোলন। [পূরুষের জন্য] কান বরাবর;[মহিলাদের জন্য] বুক বরাবর।

৩. হাত উত্তোলনের সময়; তালু এবং আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করা।

৪. আঙ্গুলসমূহ স্বাভাবিক রাখা। পরস্পর বেশী মিলানোও না এবং বেশী ফাকা রাখাও না।

৫. দাড়ানো অবস্থায় দু পা স্বাভাবিক রাখা [পুরুষের জন্য] চার আঙ্গুল এবং [মহিলাদের] জন্য দু পা মিলিয়ে।

৬. ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা;[হানাফী ফিক্বহ মতে]
[পুরুষের জন্য] নাভীর নিচে এবং [মহিলাদের] জন্য বুকের উপর রাখা।

৭. ডান হাতের তালু, বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা; বাম হাতের কব্জির উপর; হালকা ভাবে ধরে রাখা।

৮. তাকবীরে তাহরীমার এবং হাত বাধার পর সানা পাঠ করা।

৯. সূরা ফাতিহার পূর্বে 'তাআউয' (আউযুবিল্লাহি মিনাশশাইত্বনির রজিম) এবং প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতেহার পূর্বে বাসমালাহ (বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম) পাঠ করা।

১০. (ফিক্বহে হানাফী মতে)ইমাম বা একাকী ব্যাক্তি; সালাত আদায়কারী সূরা ফাতিহার শেষে আস্তে আমিন বলা।

১১. রুকু অবস্থায় দুই হাত দ্বারা দুই হাঁটু আকড়ে ধরা এবং আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখা(পুরুষের ক্ষেত্রে); আঙ্গুলগুলো হাঁটুর উপর মিলিয়ে রাখবে; হাত হাঁটুর উপর চেপে রাখা; আকড়ে ধরে নয়(মহিলার ক্ষেত্রে)।

১০. পুরুষের ক্ষেত্রে রুকু অবস্থায় পিঠ বিছিয়ে দেওয়া; তথা মাথা থেকে নিতম্ব বরাবর সোজা করা। মহিলার ক্ষেত্রে সোজা না করে কম ঝুকবে।

১১. [পুরুষ] রুকু অবস্থায় নামাযী ব্যক্তির হাত; তার দু পার্শ্ব থেকে দূরে রাখা। [মহিলা] হাটু কিছুটা ভেঙ্গে; দুই হাত পেঠের সাথে মিলয়ে রাখা; কমপক্ষে তিনবার (ِسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم) সুবহানা রব্বিয়াল আযীম বলা অথবা চাইলে অধিক বেজোড় সংখ্যায় পড়তেও পারে।

১২. রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময়; ইমামের سمع الله لِمَنْ حَمده বলা মুক্তাদির رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলা। একাকী নামাযী দুটোই বলবে।

১৩. সেজদা করার সময় নামাযীর হাত জমিনে রাখার পূর্বে, প্রথমে তার দুই হাটু, তারপর দুই হাত তারপর চেহারা রাখা। উঠার সময় শেষটি থেকে শুরু করা।

১৪. [পুরুষ] সেজদা অবস্থায় নামাযের পেট তার দুই উরু থেকে; দুই কনুই দুই পাশ থেকে এবং দুই বাহু; ভূমি থেকে পৃথক রাখা মহিলা। সবগুলি মিলিয়ে রাখবে।

১৫. সিজদা অবস্থায় হাত এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো মিলিত এবং কিবলামুখী রাখা।

১৬. দুই হাতের মাঝখানে [চেহারা রাখা] সিজদা করা।

১৭. সিজদায় কমপক্ষে তিনবার নিম্নস্বরে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলা।

১৮. পুরুষ বৈঠকের বসায় নামাযীর বাম পা বিছিয়ে দেওয়া এবং ডান পা খাড়া রেখে আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করা। [মহিলা] উভয় পা ডান দিকে বের করে জমিনের উপর বসা।

১৯. দুই সেজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দোআ পড়া।

২০. বৈঠকের অবস্থায় দুই হাত; দুই উরুর উপর রাখা।

২১. তাশাহহুদে তর্জনী [শাহাদাত আঙ্গুল] দ্বারা ইশারা করা
[ফিকহে হানাফীতে] 'লা-ইলাহা' বলার সময় তর্জনী উত্তোলন এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় তা নামিয়ে নেওয়া।

২২. শেষ বৈঠকে; তাশাহহুদের পর দরূদ এবং আদইয়ায়ে মাসূরা [হাদিসে বর্ণিত যে কোন দোআ] পাঠ করা।

২৩. 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলার সময় প্রথমে ডান দিকে তারপর বাম দিকে মুখ ফিরানো।

## নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

১. নামাযে কেরাত অশুদ্ধ পড়া

২. নামাযের ভেতর কথা বলা। ফিকহে হানাফীতে (দুনিয়াবি/সাংসারিক) প্রচলিত দুআ করা (যা কুরআন সুন্নাহে বর্ণিত নেই)। নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৩. সালাম বা সালামের এবং হাঁচির উত্তর দেওয়া।

৪. উহ-আহ শব্দ করা।

৫. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া।

৬. বিপদে কিংবা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা।

৭. নামাযে শব্দ করে হাসা।

৮. নামাযে খাওয়া ও পান করা। নামাযরত অবস্থায় কিছু খেলে বা পান করলে নামায ভেঙে যায়। দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা (ছোলা বুটের সমপরিমাণ হলে) খাবার নামাযরত অবস্থায় খেলেও নামায ভেঙে যাবে। [মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮, বই: ফিকহুস সালাত]

৯. মুক্তাদি ছাড়া অন্য ব্যক্তির লোকমা (ভুল সংশোধন) লওয়া। যেমন ইমাম সাহেব কিরাতে ভুল করছেন, সঙ্গে সঙ্গে সালাতের বাইরের কোনো লোক লোকমা দিলে তা গ্রহণ করা। [ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২২, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১/৯৮, বই: ফিকহুস সালাত]

১০. নামাযে কুরআন শরিফ দেখে পড়া। নামাযরত অবস্থায় কুরআন শরিফ দেখে দেখে পড়লে নামায ভেঙে যায়। তবে অন্যান্য ফুকাহারা এ মাসআলার ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। [মারাকিল ফালাহ ১/১২৪, হাশিয়াতুত তাহতাবি ১/৩৩৬, বই: ফিকহুস সালাত]

১১. তিন তাসবিহ পরিমাণ সতর খুলিয়া থাকা। নাভির নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীরের কোনো স্থান যদি তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় অনাবৃত থাকে, তাহলে তার নামায হবে না। তাই যদি কোনো ব্যক্তির গেঞ্জি, শার্ট বা প্যান্ট নাভির নিচ থেকে রুকু সিজদার সময় সরে গিয়ে তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় এভাবে অতিবাহিত হয়, তাহলে তার নামায ভেঙে যাবে। [ফাতওয়ায়ে শামী ১/২৭৩, মুগনিল মুহতাজ ১/১৮৮, বই: ফিকহুস সালাত]

নামাযে নারীদের মাথাও সতর। কোনো কারণে মাথার ওড়না সরে গেলে নামায ভেঙে যাবে। আয়শা (রা.) বর্ণণা করছেন: মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী ওড়না ছাড়া সালাত আদায় করলে আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না। [আবু দাউদ: ৬৪১, তিরমিজি: ৩৭৭, ইবনে মাজাহ: ৬৫৫]

১২. আমলে কাসির করা। ফিকাহবিদরা আমলে কাসিরের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মধ্যে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হওয়া, যার কারণে দূর থেকে কেউ দেখলে তার মনে প্রবল ধারণা জন্মে যে ওই ব্যক্তি সালাতরত নয়। [ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬২৪-৬২৫, বায়েউস সানায়ে ১/২৪১, বই: ফিকহুস সালাত]

১৩. নাপাক জায়গায় সিজদা করা। নামাযের জায়গা পবিত্র হওয়া জরুরি। অর্থাৎ নামায পড়ার সময় নামাযী ব্যক্তির শরীর যেসব জায়গা স্পর্শ করে, সে জায়গাগুলো পবিত্র হওয়া, যা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত। তাই নাপাক বা অপবিত্র জায়গায় সিজদা করলে নামায ভেঙে যাবে। [বাদায়েউস সানায়ে ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৭, বই: ফিকহুস সালাত]

১৪. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া। কোনো কারণে কিবলার দিক থেকে সিনা (বুক) ঘুরে গেলে নামায ভেঙে যায়। তবে যানবাহনে নামাযের ক্ষেত্রে মাসআলা ভিন্ন। [মারাকিল ফালাহ ১/১২১, নূরুল ঈজাহ ১/৬৮, বই: ফিকহুস সালাত]

১৫. ইমামের আগে মুক্তাদি দাঁড়ানো। মুক্তাদির পায়ের গোড়ালি ইমামের আগে চলে গেলে নামায ভেঙে যাবে। তবে যদি (দুজনের জামাতে সালাতের ক্ষেত্রে) মুক্তাদি ইমামের পায়ের গোড়ালির পেছনেই দাঁড়ায়, কিন্তু তিনি লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর সিজদা ইমাম সাহেবকে অতিক্রম করে যায়, তাহলে তাঁর নামাযের কোনো ক্ষতি হবে না। [বাদায়েউস সানায়ে ১/১৫৯, আল মাবসুত লিস সারাখসি ১/৪৩, বই: ফিকহুস সালাত]

প্রসিদ্ধ এই কারণগুলি ছাড়াও সালাত ভঙ্গ হওয়ার আরো কারণ আছে। যেমন, কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী পাশে এসে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ইমামের আগে কোনো রুকন আদায় করে ফেলা, ইচ্ছাকৃত ওজু ভাঙার মতো কোনো কাজ করে ফেলা, পাগল, মাতাল কিংবা অচেতন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি সালাত ভঙ্গের কারণ।

# নামাযের মাকরূহসমূহ

১. নামাযরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরূহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

২. সিজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরূহ) অবশ্য সিজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।

৩. আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

৪. বস্ত্র, শরীর অথবা দাঁড়ির সাথে খেলা করা।

৫. কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

৬. ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে তাহলে নামায নষ্ট হবে না; অবশ্য নামায মাকরূহ হবে।

৭. ওজর ছাড়াই উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের ওপর কুকুরের ন্যায় বসা।

৮. সিজদায় উভয় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।

৯. হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।

১০. ফরজ নামাযে বিনা ওজরে আসন করে বসা।

১১. মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফাজত করা।

১২. সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।

১৩. হাই তোলা। হাই ও হাঁচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।

১৪. শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।

১৫. চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিৎ।

১৬. চুল মাথার ওপর ভাজ করে গিরা দিয়ে নামায পড়া। মাথায় চুল থাকলে নামাযের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নাত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।

১৭. খোলা মাথায় নামায পড়া মাকরূহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরূহ হবে না।

১৮. আয়াত ও তাসবীহসমূহ হাতে গণনা করা। তবে সাহেবাইন (রাহি.) এর মতে এটা মাকরূহ নয়।

১৯. শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।

২০. ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।

২১. কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাঁড় করাবে। তারপরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

২২. মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

২৩. সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় নামায মাকরূহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

২৪. নামাযের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করা।

## ইসলামে নামাযের গুরুত্ব

ইসলামে নামাযের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। প্রত্যেক কাজের একটি উদ্দেশ্য থাকে। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। থাকে তার উপকারী দিকও। যেমন সিয়ামের উপকারিতা হলো নাফসের শুদ্ধি। যাকাতের উপকারিতা হলো সম্পদের পবিত্রতা। হজের উপকারিতা হলো ক্ষমা ও পাপমার্জনা। জিহাদের উপকারিতা হলো জীবনের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করা। আর নামাযের উপকারিতা হলো-আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া এবং এর মাধ্যমে নিজের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সুদৃষ্টি লাভ করা।

১. নামাযের প্রতিটি রুকনে রয়েছে তাঁর নৈকট্যলাভের বহু মাধ্যম। তাছাড়া রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি-রোজায় আমার চোখের শীতলতা, হজ ও উমরায় আমার চোখের শীতলতা কিংবা অন্য কোনো আমলে; বরং তিনি বলেছেন-

وَجُعِل قرة عيني في الصلاة

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে সালাতে। [নাসায়ী: ৩৯৪০]

এ থেকে বোঝা যায়-চোখের শীতলতা অর্জিত হয় সালাতে থাকা অবস্থায়।

২. ইসলাম যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে দ্বিতীয়টিই হলো নামায। সুতরাং নামাযের গুরুত্ব অত্যাধিক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল-এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা। [সহীহ বুখারী: ০৮; সহীহ মুসলিম: ১৬]

৩. বান্দার দুঃখ-কষ্ট, বিপদের সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা নামাযের মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার কথা বলেছেন। নামায বান্দাকে স্থির করে, বিপদেও তার রবকে স্মরণ করার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম হলো নামায। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۚ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَي الْخٰشِعِيْنَ ۙ

তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য চাও। নিশ্চয় নামায বিনয়ী ছাড়া অন্যদের জন্য কঠিন। [সূরা বাকারা: ৪৫]

৪. কিয়ামতের দিন নামাযের দ্বারা হিসাব শুরু হবে। সেখানে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ

বান্দা থেকে কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতেরই হিসাব হবে। [মুসনাদে আহমাদ: ১৬৯৪৯]

হযরত উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إِن أَهَمَ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيْعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ

নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাজত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাজত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে। [মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮]

৫. নামাযের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়। বান্দা তার জীবনের প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তার রবের উপর ভরসা করতে শিখে। স্থির-প্রশান্ত অন্তরের অধিকারী হয়।

৬. আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে সালাত প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেছেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ

তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর। [আল-বাকারা:৪৩, ৮৩, ১১০, আন-নিসা:৭৭, আন-নুর:৫৬, আল-মুযযাম্মিল: ২০]

৭. নামাযই মানুষকে অশ্লীল-মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে। বান্দার আখলাক উন্নত হয়। নিজেকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। [সূরা আনকাবুত: ৪৫]

দিনের পাঁচটি সময়ে পাঁচবার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোই তো বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। দিবস-রজনীর বিভিন্ন মুহূর্তে সে যত গুনাহ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তার গুনাহের কথা স্মরণ হয়ে যায়, সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। কারণ সে তো দাঁড়িয়েছে 'আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি'র সামনে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব জানেন। সে তো দাঁড়িয়েছে 'আলীমুম বিযা-তিস সুদূর'-এর সামনে, যিনি অন্তরের সংকল্পও জানেন।

৮. কোন ব্যক্তি মুসলিম না অমুসলিম তা পার্থক্য করার একমাত্র মানদন্ড হলো নামায। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيْمَانِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

কুফরি ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাতত্যাগ। [আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১৩, হাদীস: ২৬১৮]

৯. ইচ্ছাকৃতভাবে নামায পরিত্যাগ করা কুফরি করার শামিল। সালাত জান্নাত লাভের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত পরিত্যাগ করল সে যেন কুফরী করল। [ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসান্নিফ ফিল আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ৬, পৃ. ১৭১, হাদীস: ৩০৪৩৮]

১০. ইবাদুর রাহমানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং রাতের সালাতে দন্ডায়মান হয়। 'ইবাদুর রহমান' তথা দয়াময় আল্লাহর প্রিয় ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপাধি। দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা। যারা এই মহিমান্বিত অভিধায় ভূষিত হবেন তাদের একটি গুণ হল, তারা রাতের শেষ সময়টাকে রহমানের ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন। ইরশাদ হয়েছে-

وَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَ قِيَامًا.

আর রহমানের বান্দা তারাই যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে, অজ্ঞলোক যখন তাদেরকে সম্বোধন করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে তখন তারা বলে ‘সালাম’।

এবং যারা রাত অতিবাহিত করে নিজ প্রতিপালকের সামনে (কখনো) সিজদারত অবস্থায় এবং (কখনো) দণ্ডায়মান অবস্থায়। [সূরা ফুরকান: ৬৩-৬৪]

১১. নামাযের মাধ্যমে একজন মুমিন ঈমানের পূর্ণতা লাভ করে। আলাহর কাছে নামায আদায়কারী ব্যক্তিই পূর্ণ ঈমানদার।

১২. নামায ত্যাগকারী আল্লাহ তাআলার জিম্মায় থাকে না। যেমন- হাদীসে আছে,

مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ফরজ নামায পরিত্যাগ করে তার ওপর থেকে আলাহর জিম্মা উঠে যায়। [আত-তিরমিযী, আল-জামি'উল কবীর, খ. ১, পৃ. ১০, হাদীস: ৪]

১৩. মুমিন হিসেবে একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি আগ্রহের, আনন্দের ও তৃপ্তির বিষয় হওয়া উচিত নামায।

কুরআনে মুমিন-মুত্তাকীর পরিচয় দিতে গিয়ে ঈমানের পরেই বলা হয়েছে নামাযের কথা। ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ

(মুত্তাকী তারা) যারা গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। [সূরা বাকারা: ৩]

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, আল্লাহ তাআলা ঈমান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। আর নামাযের বিধান দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঊর্ধ্বালোকে নিয়ে। সাত আসমান পার করে আল্লাহর কাছে নিয়ে এই মহান গুরুত্বপূর্ণ উপহার ও ইবাদত দান করেছেন। অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। সুতরাং এই ইবাদত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সেই ইবাদতেই মুমিনের বিরাট সফলতা নিহিত। সেজন্য কুরআন মাজীদে সফল মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলা হয়েছে-

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ

যারা নামাযে বিনয়াবনত। [সূরা মুমিনূন: ২]

এরপর আরো কয়েকটি গুণ উল্লেখ করে শেষে আবার বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰي صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۘ

যারা নামাযের ব্যাপারে যত্নশীল। [সূরা মুমিনূন: ৯]

১৪. নিয়মিত নামায পড়তে থাকলে নামাযী হবে পবিত্র ও গোনাহমুক্ত। তবে কবীরা গোনাহ হলে অবশ্যই তাওবার মাধ্যমে ক্ষমা চাইতে হবে। ইরশাদ হয়েছে-

الصَّلَاةُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ

পাঁচ সালাত, এক জুমুআহ থেকে আরেক জুমুআহ পর্যন্ত এক রমযান থেকে অপর রমযান পর্যন্ত তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্যে কাফফারাহ হয়ে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাবীরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকবে।
[সহীহ মুসলিম: ২৩৩]

১৫. মুমিনদের সফলতা নামাযের মাধ্যমে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُون َ

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। [সূরা আল-মুমিনুন: ১-২]

১৬. কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা পরিবারকে নামাযের নির্দেশদানের তাকিদ দিয়েছেন। ইসলাম আল্লাহর মনোনীত দ্বীন। এর শিক্ষা ব্যক্তি থেকে নিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সকলের কর্তব্য একে নিজ জীবনে ধারণ করা এবং অন্যকে এর প্রতি আহ্বান করা। এটা ইসলামের সাধারণ নির্দেশ।
আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي

তুমি নিজ পরিবারকে নামাযের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে অবিচল থাক। আমি তোমার কাছে রিযিক চাই না। আমিই তো তোমাকে রিযিক দেই। আর শুভপরিণাম মুত্তাকীদের জন্য। [সূরা ত্বহা: ১৩২]

নিজের নামাযের ব্যাপারে যেমন যত্নশীল হতে হবে একইভাবে নিজ পরিবার-পরিজন যেন নামায আদায় করে সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখতে হবে।

১৭. নামায মুত্তাকীদের গুণ। যে আল্লাহকে ভয় করে চলে তাকে মুত্তাকী বলে। আল্লাহর কাছে মুত্তাকীগণ সবচেয়ে সম্মানিত। কুরআন মুত্তাকীদের একটি গুণ এই উল্লেখ করেছে যে, তারা নামায কায়েম করে। আল্লাহ ইরশাদ করেন-

الٓمّٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًي لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ
الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙوَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ
وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۗ
اُولٰٓئِكَ عَلٰي هُدًي مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আলিফ-লাম-মীম। এ কিতাবে কোনো সন্দেহ নেই; মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত- যারা অদৃশ্য বিষয়ে ঈমান রাখে এবং নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তার প্রতিও, যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম। [সূরা বাকারা: ১-৫]

১৮. নামায মুহসিনীনের বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি সৎ, সুন্দর ও অনুগ্রহের আমল করে তাকে মুহসিন বলা হয় (মুহসিন শব্দের বহুবচন মুহসিনূন)। আল্লাহ মুহসিনীনকে ভালবাসেন। কুরআনে তিনি তাঁর এই প্রিয় বান্দাদের একটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করেছেন যে, তারা নামায আদায় করে।

আল্লাহ বলেন-

الٓمّٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ ۙ هُدًي وَّرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕاُولٰٓئِكَ عَلٰي هُدًي مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

আলিফ-লাম-মীম। এ হেকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত; যা হেদায়েত ও রহমত মুহসিনীনের জন্য, যারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। এরাই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর এবং এরাই সফলকাম।

[সূরা লুকমান: ১-৫]

১৯. আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার কুরআনের প্রতি ঈমান আনা এবং একে দৃঢ়ভাবে ধরার কথা বলেছেন। এক আয়াতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরার সঙ্গে নামাযের কথাও উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ বলেন-

وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّا لَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ

আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধরে ও নামায কায়েম করে, নিশ্চয় আমি সংশোধনকারীদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। [সূরা আরাফ: ১৭০]

২০. কুরআনে অনেক জায়গায় ঈমান ও নেক আমলের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَقَامُوا الصَّلوةَ وَأَتُوا الزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, নামায কায়েম করেছে ও যাকাত আদায় করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আপন রবের কাছে তাদের প্রতিদান। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কোনো দুঃখও পাবে না। [সূরা বাকারা: ২৭৭]

নেক আমলের ভেতর নামায রয়েছে। তা সত্ত্বেও আলাদাভাবে নামাযের কথা বলা ইঙ্গিত করে, নামাযই সমস্ত নেক আমলের শীর্ষে।

২১. নামায বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ۩

"আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।" [সূরা আল-'আলাক: ১৯]

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে নামায আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো'আ কর।" [সহীহ মুসলিম ও নাসায়ী]

২২. নামায গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফ্ফারা: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল, যথাযথ খুশূ-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফ্ফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।" [সহীহ মুসলিম]

২৩। নামায সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, "সময়মত সালাত আদায় করা"। আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, "পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা"। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" [সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম]

২৪। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়।"
[সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর। [সূরা ত্বাহা: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও।” [মুসনাদে আহমদ] এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” [সুনান নাসায়ী]

২৫. নামায মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজকর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। [সূরা আল-বাকারা: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।” [মুসনাদে আহমাদ]

২৬. নামাযই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমান্বিত আল্লাহর শরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আর্ত অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوء َ

“নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?” [সূরা আন-নামল: ৬২]

নামাযে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, "তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দ্যে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে।" [মুসনাদ আহমদ]

২৭. নামাযের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰي

"এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভপরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য।" [সূরা ত্বাহা: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।"

২৮. নামায আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা: নামায অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰي عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।" [সূরা আল-'আনকাবূত: ৪৫]

অর্থাৎ নামায সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অশ্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে। এ জন্য পিতা-মাতার জরুরি কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদেরকে বাল্যাবস্থাতেই নামাযের প্রতি আগ্রহের পূর্ণ প্রশিক্ষণ দেয়, তারা যেন মন্দ-অশ্লীলতা ও খারাপ নেশায় আসক্ত না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের পিতা-মাতাকে এরই ওসীয়ত করেন এবং বলেন, "যখন তোমাদের সন্তান সাত বছরের হয় তখন তাদেরকে নামাযের আদেশ কর এবং যখন তারা দশ বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামাযের জন্য (ত্যাগ করলে) প্রহার কর এবং তাদের বিছানা আলাদা করে দাও"। [সুনান আবু দাউদ]

২৯. সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হুতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا  إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا
وَّإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ
الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰي صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।" [সূরা আল-মা'আরিজ: ১৯-২৩]

৩০. সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফাযত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكُبَّهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ

"যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।" [সহীহ মুসলিম]

## নামাযের সামাজিক গুরুত্ব

১. মুসলিম সমাজে মানুষ প্রতিদিন পাঁচবার নামায কায়েমের উদ্দেশ্যে মসজিদে সমবেত হওয়ার ফলে তাদের মাঝে সামাজিক সম্প্রীতি, একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

২. নিয়মিত নামায জামায়াতের সাথে আদায়ের মাধ্যমে নেক সোহবত লাভ হয়। একে অপরকে দেখে নেক আমল করার, নিজের আখলাক আরও উন্নত করার অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

৩. নামাযের মাধ্যমে আনুগত্যের প্রশিক্ষণ। নামাযের জন্য একজন ইমাম নির্দিষ্ট থাকেন, যার অনুকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে আনুগত্যের বন্ধন সৃষ্টি হয়। ইমামের সঠিক নেতৃত্বে মুসল্লিগণ পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রশিক্ষণ লাভ করে।

৪. মুসলমানগণ নামায আদায়ের জন্য প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে মসজিদে একত্রিত হয় এবং কাতারবন্দি হয়ে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সাথে নামায আদায় করে। এতে মানুষ নিয়ম শৃঙ্খলার প্রশিক্ষণ পায়। নিজের জীবনকেও সুশৃঙ্খল করার অভ্যাস তৈরি হয়।

৫. যে ব্যক্তি সঠিকভাবে নামায আদায় করে সে অন্যায়, অশ্লীল, যুলুম ইত্যাদি কাজ হতে দূরে থাকে। কেননা নামাযের মাঝে মানুষকে সকল প্রকার অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখার গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। নামায আদায়ের ফলে বান্দা গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সর্বদা সতর্ক থাকার চেষ্টা করে।

৬. নামাযের মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটে। বান্দা বিনয়ী হতে শিখে। সকল পরিস্থিতিতে রবের মুখাপেক্ষী হওয়ার শিক্ষা লাভ করে।

৭. জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। একে অপরের প্রতি সম্মান-সহানুভূতিশীল থাকার মানসিকতা তৈরি হয়।

৮. মানব সমাজে যখন নৈতিক ও আত্মিক অধঃপতন ঘটে, তখনই দেখা দেয় সামাজিক দ্বন্দ-কলহ, সংঘাত ও অনৈতিকতার সয়লাব। নামায মানুষের মাঝে নৈতিক সত্তা জাগ্রত করে তাকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে সহায়তা করে।

৯. জামাআতবদ্ধভাবে নামায আদায় মুসলমানদের ঐক্যের সূত্রে গেঁথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশে দিন যাপন করার নিয়মাবলি শিক্ষা দেয়।

১০. নামাযের জন্য ব্যক্তিকে তার পরিধেয় বস্ত্র, নামাযের স্থান ও শরীর পরিষ্কার এবং পবিত্র রাখতে হয়। একজন ব্যক্তি পূর্ণ নামায আদায়কারী হলে তার সকল বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা এসে যায়। এতে ব্যক্তি মনের সুস্থ বিকাশ ঘটে ও অসুস্থতা দূরীভূত হয়। তার পরিবারের মাঝেও সুস্থ মানসিকতার বিকাশ ঘটে।

১১. যে ব্যক্তি নামায আদায়ে অভ্যস্ত তার চরিত্রে সততা, ন্যায়পরায়নতা ও উদারতার বুনিয়াদ গড়ে উঠে। নামায সর্বদা ব্যক্তিকে আদর্শ নাগরিক হওয়ার পথে পরিচালিত করে। নামায ব্যক্তিকে বিনয়াবনত করে। আল্লাহর প্রতি রুজু করে।

১২. নামায পারিবারিক বন্ধন মজবুত করে। একে অপরকে নামাযের প্রতি আহবান নামায আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রেরণা জোগায়।

১৩. জামায়াতে নামায আদায়ের ফলে একে অপরের সাথে যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। ভাবের আদান-প্রদান ঘটে। সামাজিক সম্প্রীতি বজায় থাকে।

১৪. নামায বান্দাকে তার বিপদের সময় বা তার জীবনে যেকোনো পরীক্ষার সময় তাকে মানসিকভাবে স্থির রাখতে সাহায্য করে। সে নামাযের মাধ্যমে তার রবের কাছে সাহায্যের হাত তোলে। তার রবের উপরই একমাত্র পূর্ণ তাওয়াককুল করতে শিখে।

১৫. নামায অলসতা পরিহার করে বান্দাকে উদ্যোমী-কর্মঠ করে তোলে। একজন মুমিন বান্দা নামাযের সময় ঠিক রেখে তার জীবনকে পরিচালনা করতে শিখে।

## নামাযের ফযীলত

নামায সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। সে জন্য এর অনেক ফযীলত রয়েছে। যা নিম্নরূপ:

১. সালাত বা নামায হলো মুসলমানদের জান্নাত লাভের পূর্ণ নিশ্চয়তা। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّه عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

"আলাহ তাআলা বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করেছেন। যে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে এ অবস্থায় উঠবে যে, এর হককে হালকা মনে করে তা নষ্ট করা হয়নি, তবে আলাহর নিকট তার জন্য ওয়াদা হলো, তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" [(ক) ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৪৪৯, হাদীস: ১৪০১, (খ) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৬২, হাদীস: ১৪২০, (গ) আন-নাসায়ী, আল-মুজতাবা মিনাস-সুনান, খ. ১, পৃ. ২৩০, হাদীস: ৪৬১]

২. সালাত ইসলামের সকল আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল। যেমন- হাদীস শরীফে আছে,

إِنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ

"নিশ্চয় তোমাদের সর্বোত্তম আমল হলো নামায।" [আল-হাকিম, আল-মুসতাদরক আলাস-সাহীহাইন, খ. ১, পৃ. ২২১, হাদীস: ৪৪৮, ৪৪৯, হযরত সওবান (রা.) থেকে বর্ণিত ও পৃ. ২২২, হাদীস: ৪৫০, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত]

৩. নামায পূর্বের গোনাহ মিটিয়ে দেয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ كُلَّ صَلَاةٍ تَحُطُّ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيئَةٍ

নিশ্চয় প্রত্যেক নামায তার পূর্বের গোনাহ মিটিয়ে দেয়। [আহমদ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, খ. ৩৮, পৃ. ৪৮৯-৪৯০, হাদীস: ২৩৫০৩]

৪. বান্দা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত অবস্থায় থাকে।
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ

বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদাবনত। [সহীহ মুসলিম: ৪৮২]

৫. কিয়ামতের দিন নামাযের দ্বারাই জাহান্নামের আগুন নিভে যাবে এবং সহজেই সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ اللَّهَ مَلَكًا يُنَادِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ : يَا بَنِي آدَمَ! قُوْمُوا إِلَى نِيْرَانِكُمْ الَّتِي أَوْ قَدْتُمُوهَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَأَطْفِئُوهَا بِالصَّلَاةِ

"আলাহ তাআলার একজন ফেরেশতা আছে, প্রত্যেক নামাযের সময় বলে, হে বনী আদম! ওঠ এবং যে আগুন তোমরা প্রজ্জ্বলিত করেছিলে তা নির্বাপিত কর। [আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল আওসাত, খ. ৯, পৃ. ১৭৩, হাদীস: ৯৪৫২]

৬. নামায হিফাজত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন, যে তা হিফাজত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। [আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইবন মাজাহ]

৭. নামায আদায়ের ফলে আল্লাহ তা'আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন। [সূরা আত-তাওবাহ: ১০৮]

আর নামায আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা নামায শুদ্ধ হওয়ার একটি শর্ত।

৮. নামাযীরা জান্নাতে সম্মানজনক আসন পাবে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰي صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ  اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ

আর যারা নিজেদের সালাত হিফাজত করে, তারাই জান্নাতসমূহে সম্মানিত হবে। [ সূরা মাআরিজ: ৩৪,৩৫]

৯. প্রতিদিন পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ময়লা থাকে না, তেমনই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন। [বুখারী: ৫২৮]

১০. যার সালাত সুন্দর হবে তার অন্যান্য আমলগুলোও শুদ্ধ ও সঠিক হয়ে যাবে। বিপরীতে যার সালাত শুদ্ধ নয়, তার অন্য আমলও শুদ্ধ হবে না। [সহীহ তারগীব: ৩৬৯]

১১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। [মুসলিম: ৪৮৮]

১২. সাহাবী বারীরা বিন কা'ব (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে আমি আপনার সাহচর্যে থাকতে চাই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “তাহলে বেশি বেশি সিজদা কর (অর্থাৎ নফল সালাত বেশি বেশি পড়)।” [মুসলিম: ৪৮৯]

১৩. যে লোক সুন্দর করে ওযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় তার প্রতি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। [বুখারী: ৬৪৭]

১৪. জামাআতে নামায পড়লে এক নামাযে এর প্রতিদান পঁচিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয় [বুখারী: ৬৪৭]। আরেক হাদীসে আছে সাতাশ গুণ বেশি সাওয়াব হয়। [বুখারী]

১৫. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবী বুরাইদা (রা)-কে বললেন, যে ব্যক্তি রাতের আঁধারে (সালাতের জন্য) মসজিদে আসা-যাওয়া করে তাকে কিয়ামতের দিনের নূরের সুসংবাদ দাও। [সহীহ তারগীব: ৩১০]। যে ব্যক্তি তার দুই নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বেহুদা (কথা ও) কার্যকলাপ না করে তাহলে তার নাম ইল্লিয়িনে লেখা হয়। [সহীহ তারগীব: ৩১৫]

১৬. যে লোক এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকে যেন তার কলব মসজিদের সাথে ঝুলে আছে, এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে আরশের ছায়ার নিচে জায়গা দেবেন। [বুখারী: ৬৬০]

১৭. যেসব লোককে জান্নাতে নেবেন বলে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, নামাযীরা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যায়। [আবু দাউদ]

১৮. নামায কিয়ামতের দিন বান্দার ঈমানের দলীল হয়ে যাবে। বান্দা তখন তার সামনে নূর ও জ্যোতি দেখতে পাবে।

১৯. নামায ইহকালীন জীবনে এবং পরকালের জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তাদানকারী ইবাদাত। [মুসলিম]

২০. নামায হলো নয়ন জুড়ানো ও চক্ষু শীতলকারী ইবাদত। [নাসায়ী]

## নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব

প্রাণবন্ত নামায ও এর প্রকৃত স্বাদ লাভের মূলমন্ত্র হলো নিজের অস্তিত্বের পুরোটুকু আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা। নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদনের একাগ্রতা এবং একনিষ্ঠতার বিকল্প নেই। নামাযে খুশূ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা খুব দ্রুত হারিয়ে যায় এবং যার অস্তিত্ব অত্যন্ত দুর্লভ। খুশূ হলো, আমার প্রতিটা অঙ্গ শরীয়তের বিধান এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত হাওয়া। প্রত্যেক নেক আমলে খুশূ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع ، حتى لا ترى فيها خاشعا

“এ উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি তুলে নেয়া হবে, তা হল নামাযের খুশূ বা বিনয়াবনত হওয়া। ফলে তুমি কাউকে নামাযে বিনয়াবনত দেখতে পাবে না।” [মাজমাউয যাওয়ায়েদ, খ-২, পৃ-১৩৬, বই- যেভাবে নামাজে খুশু খুজু অর্জন করবেন]

খুশূবিহীন নামায বান্দাকে মন্দ এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নামাযে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হওয়ার কথা বলেছেন। নামাযে খুশূ তখন হাসিল হয়, যখন তার অন্তর নামাযের জন্য অবসর হয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশূ-বিহীন অন্তর থেকে পানাহ চেয়েছেন। কারণ, যে অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও নম্রতা নেই, তার ইলম কোনো উপকারে আসে না। দুআ কবুল করা হয় না। তিনি আমাদের দুআ শিখিয়েছেন-

“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন ইলম হতে, যা উপকারে আসে না, এমন অন্তর হতে যাতে খুশূ নেই, এমন অন্তর হতে যা পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ হতে যা কবুল হয় না।” [মুসলিম: ২৭২২, যায়িদ ইবনু আরকাম হতে বর্ণিত]

এই হাদীস বর্ণিত হয়েছে উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

ما من مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ركعتين، مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِه ووجهه ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

“কোনো মুসলিম যখন উত্তমরূপে ওযু করে অতঃপর দুই রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করে যে, তার চেহারা ও অন্তর তথা দেহ-মন পূর্ণ আল্লাহ-অভিমুখী থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।” [সহীহ মুসলিম: ২৩৪]

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইবাদাতের ফল ও উপকারিতা রেখেছেন খুশূ-খুযুর মাঝে। আর খুশূ-খুযুকে করেছেন সাওয়াব ও নৈকট্যলাভের মাধ্যম। খুশূ-খুযুর সাথে বান্দা যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমল আল্লাহর কাছে পেশ করছে, কিয়ামাতের দিন তিঁনি তার সামনে তা বৃহৎ আকারে তুলে ধরবেন।

## নামাযে খুশূ-খুযু হাসিলের সহায়ক তিনটি বিষয়

১. নামাযে মনকে সম্পূর্ণ আল্লাহ তা'আলার দিকে নিবদ্ধ করা। নামাযে যেসকল বিষয় পাঠ করতে হয়, তা বুঝে পড়ার চেষ্টা করা। কুরআনের আয়াতসমূহ, যিকির, দুআ ইত্যাদিতে চিন্তা-ফিকির করা। আর মনের মধ্যে এই বিষয় হাজির করা যে, সে এখন তার রবের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মালিক তাকে দেখছেন। সে একমাত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার সাথে কথা বলছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

أن تَعْبُدَ الله كأنك تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

“তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।” [সহীহ মুসলিম: ৮]

নামায শুরু করার আগেই এটা অন্তরে গেঁথে নেয়ার চেষ্টা করা। এভাবে বান্দা যখন নামায আদায় করবে তখন সে নামাযের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম হবে। নামাযের প্রতি তার আগ্রহ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

২. যেসব অনর্থক কথাবার্তা-কাজ চিন্তা করার কারণে নামাযে অমনোযোগী হয়ে উঠে, সেসকল বিষয় প্রতিহত করার চেষ্টা করা। যেসকল বিষয় নামাযের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, সেগুলোর ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা এবং সতর্ক থাকা। চিন্তাভাবনা থেকে অন্তরকে মুক্ত করতে না পারলে নামাযের প্রকৃত স্বাদ আসে না। যেসব উপকরণগুলো অবলম্বন করলে নামাযে খুশূ-খুযু আনে এবং মনোযোগ আসে সেগুলোর ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি যতটুকু মনোযোগী হব, তিনিও আমাদের প্রতি (করুণা ও পুণ্য দানে) ঠিক ততটাই মনোযোগী হবেন। আর আমরা যদি মন ফিরিয়ে নিই, তিনিও মনোযোগ ফিরিয়ে নেবেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন, যতক্ষণ সে সালাতের মাঝে অন্য কোনোদিকে মনোযোগ না দেয়। যখন বান্দা সালাত থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলে, আল্লাহ তাআলাও আপন মনোযোগ সরিয়ে নেন। [নাসায়ী: ১১৯৬]

৩. আল্লাহ তা'আলার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন এবং নৈকট্যলাভের আশা রাখা। নিজেকে সম্পূর্ণ বিনয়াবনত রাখা এবং তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম ফেরানো পর্যন্ত একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করা। এমনভাবে নামায আদায় করা যেন এটাই জীবনের শেষ নামায। খুশূর

সাথে নামায আদায়ে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদানে আশা রাখা। পাশাপাশি পার্থিব যে সকল বিষয় নামাযের পূর্ণ সাওয়াবকে বিনষ্ট করে দেয়, তা থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করবেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে:

মানুষ সালাত শেষ করার পর তার জন্য সাওয়াবের এক-দশমাংশ লেখা হয়, এমনিভাবে কারও জন্য এক-নবমাংশ, কারও জন্য এক-অষ্টমাংশ, কারও জন্য এক-সপ্তমাংশ, এভাবে ব্যক্তিভেদে এক-ষষ্ঠাংশ, এক-পঞ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, আর কারও জন্য অর্ধেক সাওয়াব লেখা হয়। [সুনানু আবী দাউদ: ৭৯৬]

## নামায ছেড়ে দেয়ার পরিণতি

আধুনিককালে অনেক মুসলিম নামাযের প্রতি অবহেলা করে, উদাসীন থাকে। আবার কেউ কেউ নামায একদম পরিত্যাগ করে যার পরিণাম খুবই ভয়াবহ।

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ

কোনো লোক এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত পরিত্যাগ করা। [সহিহ মুসলিম: ২৫৬]

২. বেনামাযী জাহান্নামে যাবে, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ

কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করালো? [সূরা আল মুদ্দাসসির: ৪২]

قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ

তারা বলবে, ‘আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না’। [সূরা আল মুদ্দাসসির: ৪৩]

৩. বেনামাযীকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۙ

তাদের পরে আসলো এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম: ৫৯]

আপনি কি জানেন "গাইয়া" কী? গাইয়া হলো, জাহান্নামের একটি নদীর তলদেশ, যার গভীরতা অনেক, যেখানে রয়েছে রক্ত ও পুঁজের নিকৃষ্টতম আস্বাদ। [তাফসীর ইবন কাসীর]

৪. যে ব্যক্তি নামায পরিত্যাগ করে সে তার স্বীয় পরিবার এবং ধনসম্পদ নষ্ট করে দেয়ার চেয়েও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন -

الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

"যে ব্যক্তির আসর সালাত ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও ধন সম্পদ নষ্ট হয়ে গেল।" [সহীহ মুসলিম]

৫. কিয়ামতের দিন কাফির সরদার কারূন, ফির'আউন, হামান ও উবাই ইবন খালফের সাথে বেনামাযীর হাশর হবে। যেমন, হাদীসে এসেছে:

من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاة يوم القيامة وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلفً

"যে ব্যক্তি সালাতের হিফাজত করলো, সালাত তার জন্য কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে, আর যে সালাতের হিফাজত করলো না, তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন জ্যোতি, প্রমাণ ও নাজাতের উসীলা হবে না এবং কারূন, ফির'আউন, হামান এবং উবাই ইবন খালফের সাথে তার হাশর হবে।" [মুসনাদে ইমাম আহমদ]

ইমাম আহমদ রহ. এ হাদীসকে সালাত পরিত্যাগকারীর কুফুরীর ব্যাপারে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা বড় বড় কাফিরদের সাথে বেনামাযীর হাশর হওয়ার জন্য তার কুফুরী সাব্যস্ত হওয়া চাই। ইবনুল কাইয়্যেম রহ. বলেন, "এই চার জনকে বিশেষভাবে এ জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা কাফিরদের নেতা।"

৬. সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিঁনি বলেন,

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰي

যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। [সূরা ত্বাহা: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত নামাযে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরণের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

## নেফাকিপূর্ণ নামায

নিফাক ও কপটতা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কুরআনে মুনাফিকদের কপটতার নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। এক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাদের চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, অথচ তিনিই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেন। আর তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে। [সূরা নিসা : ১৪২]

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদের চারটি চরিত্র তুলে ধরেছেন-

ক. তারা আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে।

বলাবাহুল্য, আল্লাহকে ধোঁকা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি সর্বজ্ঞ। কিন্তু মুনাফিকরা কপটতা করে মনে করে তারা আল্লাহকে ধোঁকা দিয়ে ফেলছে; আল্লাহ তাদের কপটতা সম্পর্কে অবগত নন!

খ. তারা অলসতার সাথে নামায পড়ে। নামাযকে বোঝা মনে করে।

গ. তারা মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়ে; আল্লাহর প্রতিদানের আশায় কিংবা তাঁর আযাবের ভয়ে নয়।

ঘ. তারা নামাযে আল্লাহকে খুব সামান্যই স্মরণ করে। অথচ নামায হচ্ছে আগাগোড়া আল্লাহর যিকির ও স্মরণ। যিকিরপূর্ণ সেই ইবাদতেই তারা আল্লাহকে অল্প স্মরণ করে। এ থেকে আন্দাজ করা যায় তারা কত অলস ও উদাসীন!

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُون.َ

তাদের দান কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা কেবল এটা যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে এবং তারা নামাযে আসে (চরম) অলসতার সাথে এবং তারা ব্যয় করে (খুব) অনিচ্ছার সাথে। [সূরা তাওবা: ৫৪]

এ আয়াতে মুনাফিকদের নিফাকের তিনটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে-

ক. তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে কুফরী করেছে।

হাঁ, মুনাফিকরা আসলে কাফের। তাদের মধ্যে আর অন্য কাফেরদের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, অন্য কাফেররা অন্তরের মত মুখেও ইসলামকে অস্বীকার করে আর তারা অন্তরে অবিশ্বাস করে মুখে বিশ্বাসের কথা বলে।

খ. তারা চরম অলসতার সাথে নামাযে আসে।

গ. তারা আল্লাহর পথে খুব অনিচ্ছায় অর্থ ব্যয় করে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُونُ

দুর্ভোগ সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্পর্কে উদাসীন, যারা মানুষকে দেখায় এবং নিত্য ব্যবহার্য জিনিসও দেয় না। [সূরা মাউন: ৪-৭]

এখানে আল্লাহ মুনাফিকদেরকে দুর্ভোগের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, যারা নামায সম্পর্কে উদাসীন। নামাযের প্রতি, নামাযের ওয়াক্তের প্রতি যাদের গুরুত্ব নেই। যারা ইচ্ছা করে বিনা ওজরে নামাযের সময় নষ্ট করে। আর যাই পড়ে কেবল মানুষের ভয়ে পড়ে। যেখানে মানুষের ভয় নেই সেখানে নামায ছেড়ে দেয়।

উপরিউক্ত আয়াতগুলোয় আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের কপটতাপূর্ণ নামাযের নিন্দা করে মুমিন বান্দাদের শিক্ষা দিচ্ছেন তারা যেন আগ্রহ, উদ্যম ও যত্নের সাথে নামায পড়ে এবং তাঁকে স্মরণ ও সন্তুষ্ট করার জন্য পড়ে। নামাযের ব্যাপারে অলসতা, উদাসীনতা ও লৌকিকতা না করে। নামাযে সঙ্গে এহেন আচরণের পরিণতি দুর্ভোগ।

## নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামায

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে বেশি প্রশান্তি পেতেন নামাযে। নামায ছিলো তার চোখের শীতলতা। নামাযের মাঝেই তিনি তার হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পেতেন। তিনি সারারাত রবের সামনে বিনীতভাবে দন্ডায়মান হওয়ার মধ্যেই অন্তরে শীতলতা অনুভব করতেন। তিনি ছিলেন অধিক শুকরিয়া আদায়কারী। তিনি তার রবের শোকরগুজার বান্দা হওয়ার জন্য তার পা ফুলে যাওয়া সত্ত্বেও রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (সহীহ) মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত অধিক নামায আদায় করতেন যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলঃ আল্লাহ্ তো আপনার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন?

তিনি বললেনঃ “আমি কি একজন শোকর গুজার বান্দা হব না?”
[হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী: ১১৩, মুসলিম: ২৮১৯, তিরমিযী: ৪১২, নাসায়ী ৩/২১৯]

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন এমনকি তাঁর পদযুগল ফুলে যেতো। আমি তাঁকে বললামঃ কেন আপনি এরূপ করছেন? অথচ আপনার তো পূর্বের পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে? তিনি বললেনঃ “আমি কি একজন কৃতজ্ঞ পরায়ন বান্দা হতে পছন্দ করব না?”
[হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বুখারী: ১১৩ ও মুসলিম: ১৮১৯]

তিনি ছিলেন একাধারে সিজদাকারী, রুকুকারী, অধিক শুকরিয়া আদায়কারী, আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতকারী। কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা যেসকল ইবাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, তিনি সেসকল আয়াতের একনিষ্ঠ অনুসরণকারী। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

হে মুমিনগণ, তোমরা রুকূ‘ কর, সিজদা কর, তোমাদের রবের ইবাদাত কর এবং ভাল কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফল হতে পারবে। [সূরা হজ্জ: ৭৭]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিক নামায এবং কুরআন তিলাওয়াত করার মাধ্যমে প্রশান্তি পেতেন। তিনি রাতে অধিক নামায আদায় করতেন। কষ্ট ও ক্লান্তির পর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৃদয়ের প্রশান্তি চাইতেন তখন বিলাল রাযিয়াল্লাহু 'আনহুকে বলতেন-

يَا بِلَالُ ، أَقِمْ الصَّلَاةَ أَرِحْنَا بِهَا

বিলাল, সালাত দ্বারা আমার অন্তরকে প্রশান্ত করো। ক্লান্তি থেকে মুক্তি দাও। [আবু দাউদ: ৪৯৮৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করত তখন তিনি তাকে সর্বপ্রথম নামাযের অঙ্গীকার করাতেন। হযরত আবু যর রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে একবার বের হলেন। ঐ সময় গাছের পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছ থেকে দুটি ডাল নিয়ে সেগুলো নাড়া দিয়ে পাতা ফেলতে থাকেন এবং বললেন, আবু যর! আমি বললাম, লাববাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো মুসলমান যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামায আদায় করে তখন তার গুনাহগুলো এভাবে ঝরে যায় যেমন এই গাছ থেকে পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে। [মুসনাদে আহমদ: ৫/১৭৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নফল নামাযে দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ কিরাত পড়তেন। কখনও কখনও প্রথম রাকাতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল ইমরান, তৃতীয় রাকাতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাকাতে সূরা মায়িদা পড়তেন। তিলাওয়াত করতেন তারতীলের সাথে। রহমতের আয়াত এলে থেমে রহমতের জন্য দুআ করতেন, আযাব ও শাস্তির আয়াতে পৌঁছলে আযাব থেকে পানাহ চাইতেন। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা ফুলে যেত, কিন্তু তিনি নামাযের মধ্যে এমনভাবে মগ্ন হয়ে থাকতেন যে, সেদিকে তাঁর কোনো খেয়ালই হত না। তদ্রূপ নামায পড়ায় ব্যঘাত সৃষ্টি হলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন।

আম্মাজান হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নফল নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন-

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে প্রথমে (দুই রাকাত করে) চার রাকাত নামায পড়তেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথা তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপর আবার (দুই রাকাত করে) চার রাকাত পড়তেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথাও জানতে চেয়ো না। এরপর তিন রাকাত (বিতির) পড়তেন। [সহীহ বুখারী: ১১৪৭]

আরেকটি উদাহরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন রাতে নফল নামাযে দাঁড়ালেন। সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাঁর সঙ্গে নামাযে শরীক হলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায এতটাই দীর্ঘ করছিলেন, যার সঙ্গে পেরে না উঠে হযরত ইবনে মাসউদ রা. নামায ছেড়ে দিতে চাইলেন। তার বক্তব্য এমন-

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ.

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক রাতে নামায পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় নামাযে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একপর্যায়ে আমি এক মন্দ চিন্তা করতে লাগলাম।

উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কী চিন্তা করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন-

هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم.

আমি চাইছিলাম, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এ নামায ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি! [সহীহ বুখারী: ১১৩৫]

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীস। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল-

أي الصلاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟

ফরয নামাযের পর সেরা নামায কোনটি?

তিনি উত্তরে বললেন-

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ الليل.

ফরযের পর সেরা নামায হচ্ছে- গভীর রাতে আদায় করা নামায। [সহীহ মুসলিম: ১১৬৩]

শেষ রাতের নামাযের ফযীলত সম্পর্কেও অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীস লক্ষ করুন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ، فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه.ُ

আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতেই দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে তখন। তিনি তখন বলতে থাকেন- কে আছে, আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছে, আমার কাছে চাইবে? আমি তার চাওয়া পূরণ করব। কে আছে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব। [সহীহ মুসলিম: ৭৫৮]

মুসনাদে আহমাদের আরেকটি বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। রবীআ আসলামী রা. নামের এক সাহাবী। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমত করতেন। রাতে এশার নামাযের পর যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে চলে যেতেন, তখনও তিনি প্রায় বসে থাকতেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজার বাইরে। যদি কোনো প্রয়োজনে তিনি আবার বেরিয়ে আসেন- এ অপেক্ষায়। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে তিনি নিজেকে এভাবেই বিলিয়ে দিয়েছিলেন। এমন খেদমতের ফলে একদিন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, রবীআ, তুমি আমার কাছে কিছু চাও, আমি তোমাকে দেব। রবীআ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটু চিন্তা করে নিই। এরপর আপনাকে জানাব।' তার ভাষ্য হল- এরপর আমি নিজে নিজে অনেক ভাবলাম। আমি দেখলাম, দুনিয়া শেষ হয়েই যাবে, এটা অস্থায়ী। আর এখানে আমার যে রিযিক আছে তা-ই আমার জন্যে যথেষ্ট এবং তা আমার কাছে চলেও আসবে। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার আখেরাতের জন্যে কিছু চাইব। কারণ তিনি তো আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এরপর আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, তিনি বললেন, কী করলে, রবীআ! আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে আমার চাওয়া- আপনি আমার জন্যে আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করে আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দেবেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, একথা তোমাকে কে বলে দিয়েছে? আমি

বললাম, না, আল্লাহর কসম, কেউ আমাকে বলে দেয়নি; বরং আপনি যখন আমাকে কিছু চাওয়ার কথা বলেছেন, আর আপনি তো আল্লাহর নিকট অনেক মর্যাদাশীল, তখন আমি নিজে নিজেই ভাবলাম; আমি দেখলাম, দুনিয়া অস্থায়ী, তা শেষ হয়ে যাবে। এখানে আমার যে রিযিক তা আমার কাছে আসবেই। তখনই আমি মনে মনে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আমি আমার আখেরাতের জন্যে কিছু চাইব। একথা শুনে তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপ করে রইলেন।

এরপর বললেন-

إِنِّي فَاعِلٌ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

ঠিক আছে, আমি অবশ্যই তা করব। তবে তুমি আমাকে তোমার নিজের বিষয়ে অধিক সংখ্যক সিজদা দিয়ে সহযোগিতা করো। [মুসনাদে আহমাদ: ১৬৫৭৯]

লক্ষণীয় বিষয় হল, হাদীসে যে দীর্ঘ সময় ধরে নামাযে দাঁড়িয়ে থাকাকে সর্বোত্তম নামায বলা হয়েছে, এর অর্থ এই নয়- কেবল নামাযের কিয়ামটুকুই দীর্ঘ হবে, আর রুকু-সিজদা ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত হবে; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল ছিল এমন- তিনি যখন দীর্ঘক্ষণ নামাযে তিলাওয়াত করতেন, রুকু-সিজদাগুলোও দীর্ঘ করতেন। এভাবে তিনি পুরো নামাযের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতেন। একবারের ঘটনা। রাতের বেলা সাহাবী হযরত হুযাইফা (রা.) নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নামায পড়ছিলেন। হুযাইফা (রা.) নিজে এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন-

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা বাকারা পড়তে শুরু করেছেন। আমি ভাবলাম, তিনি ১০০ আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। ১০০ আয়াত শেষ করে তিনি আরও সামনে পড়তে লাগলেন। তখন ভাবলাম, তিনি হয়তো এক রাকাতেই সূরা বাকারা শেষ করবেন। সূরা বাকারা শেষ করার পর তিনি আরও পড়তে লাগলেন। এক সূরা। এরপর আরেক সূরা। তাঁর কুরআন তিলাওয়াত ছিল খুবই ধীরস্থির। তিলাওয়াতের মাঝে যখন তাসবীহ পাঠের কথা আসত, তিনি তাসবীহ পাঠ করতেন, যখন দুআ করার কোনো বিষয় আসত, তিনি দুআ করতেন, যখন কোনো কিছু থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রসঙ্গ আসত, তিনি তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এরপর সূরা বাকারা থেকে সূরা নিসা পর্যন্ত শেষ করার পর তিনি রুকুতে গেলেন। সেখানে রুকুর তাসবীহ পাঠ করলেন। তাঁর রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় কাছাকাছি। এরপর দাঁড়ালেন। এবার দাঁড়ানো অবস্থায়ও রুকুর কাছাকাছি সময় কাটিয়ে দিলেন। এরপর সিজদায়

গেলেন। সেখানে সিজদার তাসবীহ পাঠ করলেন। তাঁর সিজদাও ছিল দাঁড়িয়ে থাকার প্রায় কাছাকাছি সময় ধরে। [সহীহ মুসলিম: ৭৭২]

এভাবে দীর্ঘ সময় নিয়ে কিয়াম, রুকু, কওমা, সিজদা আদায় করার ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে এই একটিই নয়। হাদীসের কিতাবে এমন বর্ণনা প্রচুর রয়েছে। এসব ঘটনা থেকে এ ভারসাম্যই প্রমাণিত হয়- নামাযের কিয়াম যখন দীর্ঘায়িত হবে, রুকু-সিজদাও দীর্ঘ হবে।

## সাহাবায়ে কেরামের নামায

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নির্দেশমতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করেছেন। এক্ষেত্রে গোটা উম্মতের ইতিহাসে তাঁদের রয়েছে অনন্য বৈশিষ্ট্য। নবীজীর আনুগত্যের যে দৃষ্টান্ত তাঁরা স্থাপন করেছেন এর নজির কেবল তাঁরাই। তাঁরা তাঁর আদেশ-নিষেধ, শিক্ষা-নির্দেশনা, বাণী, কর্ম সবকিছুর অনুসরণ করতেন। তাঁর চোখের ইশারা ও মনের ভাষা পর্যন্ত অনুধাবন করতেন। তাঁর আদেশ-নিষেধ মানার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁর আদেশকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিতেন। তাঁর পছন্দ নয় এমন কাজ পরিহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করতেন না। আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, চলাফেরা, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শরূপে ধারণ করেছিলেন। তাঁদের জীবন ছিল নববী-আদর্শের জীবন্ত ছবি। নবীজীর পরিপূর্ণ ও একনিষ্ঠ আনুগত্যই গোটা উম্মতের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মে পরিণত করে।

সাহাবীদেরও নামাযের সাথে ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত।
হযরত আবু বকর রা.-এর নামাযে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন এমন নিশ্চুপ ও নিশ্চল হয়ে থাকতেন, মনে হত, একটি কাঠ মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়েছে।

হযরত ওমর রা.কে যখন কুখ্যাত আবু লূলূ খঞ্জর দিয়ে আহত করে তখন তিনি বারবার বেহুশ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় কেউ তাঁকে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ নামায পড়ে নিলেন এবং বললেন, 'আমি যদি নামায পড়তেই অক্ষম হয়ে যাই তবে বেঁচে থেকে আর লাভ কী?'

এক যুদ্ধের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা দুজন সাহাবীকে পাহারার দায়িত্ব দিলেন। তাঁদের একজন ছিলেন মুহাজির অপরজন আনসারী। দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন, আমাদের একজন রাতের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পাহারা দিবে অপরজন বিশ্রাম নিবে। অতঃপর দ্বিতীয় জন উঠে পাহারা দিবে আর প্রথম জন বিশ্রাম নিবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাতের প্রথমভাগে আনসারী সাহাবী পাহারা দেওয়া শুরু করলেন এবং মুহাজির সাহাবী শুয়ে পড়লেন। আনসারী সাহাবী ভাবলেন শুধু বসে না থেকে বরং নামায পড়ি। নামায শুরু করার পর শত্রুশিবির থেকে এক কাফের এসে তাঁকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তীর ছুড়ল। তিনি অবিচল দাড়িয়ে থাকলেন। ঐ দুশমন মনে করল তীর হয়তো ঠিকমতো লাগেনি। তাই সে আবার তীর ছুড়ল। এদিকে ঐ সাহাবী একভাবেই দাড়িয়ে রইলেন।

ওদিকে ঐ দুশমনও একের পর এক তীর ছুড়তে লাগল। আর তা সাহাবীকে বিদ্ধ করতে থাকল। সাহাবী ধীরস্থিরভাবে রুকু-সেজদা আদায় করে যথারীতি নামায শেষ করলেন এবং মুহাজির সাথীকে জাগ্রত করলেন।

মুহাজির সাহাবী তাঁর শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে দেখে ব্যাকুল হয়ে গেলেন এবং ঘটনা শুনে বললেন, তুমি আমাকে আরো আগে কেন জাগ্রত করনি? আনসারী উত্তর দিলেন, আমি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলাম, শেষ না করে রুকুতে যেতে ইচ্ছে হল না।

কিন্তু পরে আশঙ্কা হল আমার গায়ে যেভাবে তীর বিদ্ধ হচ্ছে তাতে যেকোনো অবস্থায় আমি শহীদ হয়ে যেতে পারি। আর তোমাকে জাগানোর আগেই যদি আমি শহীদ হয়ে যাই তাহলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে উদ্দেশ্যে পাহারা দিতে বলেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে ফেলেছি। যদি এ আশংকা না হত তাহলে সূরা শেষ না করে আমি রুকুতে যেতাম না। যদিও আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাক না কেন? নবীজী তো বলেছেন, নামাযে আমার চোখে শীতলতা। নবীজীর সাহাবীরা তো নামায বিহীন জীবনকে অনর্থক মনে করতেন। নামাযের মধ্যে সামান্য অমনোযোগিতার কারণে তাঁরা লক্ষ টাকার বাগান সদকা করে দিতেন। তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সকল কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তা হুবহু পালনে সচেষ্ট থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ হুবহু অনুসরণের ফলে তাদের নামায ও নামাযের বাইরের জীবন ঈমানের দ্যুতি ছড়িয়ে গেছে যা আমাদের জন্য অনুসরণীয়।

হযরত রাবীআ ইবনে কা'ব আলআসলামী রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করলাম। তখন আমি তাঁর কাছে ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে কোনো কিছু চাও।

আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করছি।

তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু?

আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন-

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود.

তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা (তথা নামায) আদায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর।
[সহীহ মুসলিম: ৪৮৯]

অর্থাৎ সিজদা ও নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একবার সাওবান রা.-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন-

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اللهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

বেশি পরিমাণে আল্লাহ তাআলাকে সিজদা কর। নিশ্চয় তুমি একবার আল্লাহ তাআলাকে সিজদা করলে তিনি তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। [সহীহ মুসলিম: ৪৮৮]

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারুক রা. একবার ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে ফরমান পাঠালেন। সেখানে লিখলেন-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামায। যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং গুরুত্বের সাথে নামায আদায় করবে সে তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামায নষ্ট করবে (নামাযের ক্ষেত্রে অবহেলা করবে) সে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক নষ্টকারী (অবহেলাকারী) হয়ে থাকবে। [মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬]

## সালাফদের নামায

১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির (রাহি.) বলেন, “সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর-এর সালাতের দৃশ্য যদি তুমি দেখতে! তিনি গাছের ডালের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর শত্রুর ছোঁড়া কামানের গোলা, ধুলোবালি উড়ে এসে এদিক সেদিক পড়ছিল।” [ইবনু আসাকির, তারীখু মাদিনাতি দিমাশক, ২৮/১৭১]

মুজাহিদ বলেন, "সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর এমন বিনয়ের সাথে সালাতে দাঁড়াতেন, যেন একটি কাঠের লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।" [ইবনু আসাকির, তারীখু মাদিনাতি দিমাশক, ২৮/১৬৯]

ইয়াহইয়া ইবনু ওয়াছাব বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর এমনভাবে সিজদাহ করতেন যে, পাখি এসে তাঁর পিঠে বসে যেত। পাখিগুলো তাঁকে মাটির ঢিবি মনে করত। [ইবনু আসাকির, তারীখু মাদিনাতি দিমাশক, ২৮/১৭০]

২. মুসলিম ইবনু ইয়াসার(রাহি.) একদিন মাসজিদে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় মাসজিদের একটি অংশ ধ্বসে পড়লে লোকজন শোরগোল শুরু করে। কিন্তু তিনি টেরও পেলেন না যে, মাসজিদের একটি অংশ ধ্বসে পড়েছে। [আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক(রাহি.), আয-যুহদ, ১০৮২; গ্রন্থকার হুবহু বর্ণনা করেননি]

৩. ইয়াকুব হাযরামী(রাহি.) ছিলেন তাঁর সময়ের সেরা সাধকদের একজন, তাঁর জুড়ি মেলা ছিল কঠিন। বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় চোর এসে তাঁর কাঁধ হতে চাদর চুরি করে পালাতে উদ্যত হয়। কেউ একজন তা দেখে ফেলে এবং চাদরটি উদ্ধার করে আবার তাঁর কাঁধে রেখে দেয়া হয়। অথচ তিনি কিছুই টের পাননি। [ইমাম যাহাবী, মা'রিফাতুল কুররা, ৯৫]

৪. হুসাইন ইবনু আলি(রা.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর সিজদারত অবস্থায় ঘরে আগুন লেগে যায়। লোকজন তাঁকে ডেকে বলতে থাকে, “হে নবিজির বংশধর। আগুন! আগুন!" কিন্তু তিনি সিজদাহ থেকে মাথা উঠালেন না। এক সময় আগুন নিভে গেল। সালাত শেষ হলে তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বললেন, “অন্য এক আগুন আমাকে বিচলিত করে রেখেছিল।” [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৩৯১]

৫. মুসলিম ইবনু ইয়াসার(রাহি.) যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তার আগে পরিবাবের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, “এবার তোমরা কথা বলো কারণ (সালাতে) আমি তোমাদের কথা শুনতে পাই না।” [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৪/৫১২]

৬. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল বুখারি(রাহি.) এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তিনি নিজ গোত্রের লোকজনের সাথে চাষাবাদের জমিতে গেলেন। সেখানে তিনি লোকজনের সাথে যুহরের সালাত আদায় করলেন। ফরয সালাত শেষে তিনি নফল সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। সালাত শেষে পোশাকের নিচের দিক থেকে উঠিয়ে সাথের একজনকে বললেন, “দেখো তো, জামার নিচে কিছু আছে কিনা?” লোকটি দেখল একটি বোলতা জাতীয় পতঙ্গ ঢুকে প্রায় ১৬/১৭ জায়গায় হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। শরীরের সে জায়গাগুলো ফুলে উঠেছে। কয়েকজন বলে উঠল, “এই অবস্থায় আপনি প্রথমেই সালাত ছেড়ে দিলেন না কেন?’ ইমাম বুখারি বললেন, ‘আমি একটি সূরা শুরু করেছিলাম। ভাবলাম তা শেষ করে নিই আগে!” [ইমাম যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১২/৪৪২]

৭. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াকূব আল-আহযাম(রাহি.) বলেন, “আমরা মুহাম্মাদ ইবনু নাসর মারুযী(রাহি.) -এর চেয়ে উত্তমরূপে সালাত আদায় করতে আর কাউকে দেখিনি। একবার তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় একটি বোলতা তাঁর কানে হুল ফুটিয়ে দিল। এতে কান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ল (তিনি টেরই পাননি)। কিন্তু তিনি নিজ হাতে তা তাড়ালেন না। আমরা তাঁর সালাতের সৌন্দর্য, বিনয় ও ভক্তি দেখে মুগ্ধ হতাম। তিনি বুকে থুতনি ঠেকিয়ে এমনভাবে সালাতে দাঁড়াতেন, যেন এক টুকরো শুকনো কাঠ।” [ইমাম যাহাবী, সিয়াক আলামিন নুবালা, ১৪/৩৬,৩৭]

৮. রবী ইবনু খাইসাম(রাহি.) বলতেন, “আমি যখন সালাতে দাঁড়াই, একটি দুশ্চিন্তাই তখন আমাকে তাড়া করে বেড়ায়। তা হলো, আমি সালাতে কী বলছি আর (বিচার দিবসে) আমাকে কী বলা হবে?” [ইমাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/১৭১]

৯. আমির ইবনু আবদি কায়িস(রাহি.)-কে একদিন বলা হলো, “আপনার অন্তর কি সালাতে আপনাকে কিছু বলে?” তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন আমি আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াই, আর আমার গন্তব্য হয় দুটি স্থানের যেকোনো একটির অভিমুখে। অর্থাৎ, জান্নাত ও জাহান্নাম।”

তাঁকে আরও বলা হলো, “আমরা পার্থিব বিষয়াদিতে যা কিছু পাই, আপনি কি সালাতে তা-ই পান?” তিনি বললেন, “আমার বার্ধক্য আসা পর্যন্ত আমার নিকট সালাতের চেয়ে প্রিয় কিছু হয়নি।” [ইনাম গাযালী, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ১/১৭১, ইনাম গাযালি আমির ইবনু আব্দুল্লাহ

লিখেছেন। তবে ইমাম যাহাবী। ও ইবনু আসাকির নিজ নিজ গ্রন্থে ইবনু আবদি কায়িস লিখেছেন। সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৪/১৭। তারীখু মাদিনাতি দিমাশক, ২৬/২৪]

১০. হাসান ইবনু আমর ফাযারি(রাহি.) বলেন, "আমর ইবনু উতবা (রাহি.) -এর একজন মুক্তদাস আমাদেরকে তাঁর ব্যাপারে বলেন, একবার শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযানে বের হই। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত সালাত আদায়ের কারণে আমরা ঠিকমত দেখাশোনা করতে পারছিলাম না। একদিন রাতে তাঁকে আমরা সালাত আদায় করতে দেখি। এমন সিংহের গর্জন শুনে আমরা সবাই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু তিনি কোনো নড়াচড়া না করে সালাতেই মন্ত্র রইলেন। আমরা তাঁকে বললাম, আপনি কি বাঘ-সিংহ ভয় পান না? তিনি বললেন, আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কিছুকে ভয় পেতে আমার লজ্জা লাগে।" [আবু নুআইম ইসপাহানী, হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/১৫৭]
[মনের মতো সালাত বই থেকে সংগৃহীত]

## শেষকথা

নামাযের মূল নির্যাস হলো- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে ধাবিত হওয়া, তার নৈকট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হওয়া। নামাযের মাধ্যমেই বান্দার সাথে রবের সম্পর্ক মজবুত হয়। নামাযের আদ্যোপান্ত নিয়ে চিন্তা করলে বোঝা যায়, নামায কত বড় প্রভাবক বিষয়। মুমিন যদি সচেতনভাবে নিয়মিত নামায আদায় করে, তাহলে অবশ্যই নামায তাকে ভেতরে-বাইরে উন্নত থেকে উন্নত অবস্থানে নিয়ে যাবে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিন্তু বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও উত্তম, তিনি পবিত্র ও উত্তম বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না।" [মুসলিম, ১০১৫, আবূ হুরায়রা হতে, যাকাত অধ্যায়]
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ ওসীয়তটি ছিলো নামায। তিনি তার জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তার উম্মতকে নামাযের আহবান জানিয়েছেন। বিচারের দিন বান্দার আমলনামার প্রথম প্রশ্ন ই হলো নামায সম্পর্কে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসেব নেয়া হবে। যদি সালাতের হিসেব ঠিক থাকে, তবে বাকি আমলও ঠিক হয়ে হবে। আর যদি সালাত খারাপ হয়ে থাকে, তবে বাদবাকি আমলও খারাপ হয়ে যাবে।" [তাবারানি, আওসাত, সনদ ত্রুটিহীন; আত-তারগীব, ১/২৪২]

সালাত ই হলো অন্তরের খোরাক। বান্দার অন্তর যখন আল্লাহ স্মরণ থেকে গাফেল হতে থাকে তখন ধীরেধীরে তা শুকনো মরুভূমিতে পরিণত হতে থাকে। গাফেল অন্তরে শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ধ্বংস তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহ স্মরণের ব্যাপারে আরও শক্ত হয়ে গেছে; তারা আছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে। [সূরা যুমার: ২২]
হাদিসে আছে, জান্নাতবাসীদের একটি আফসোস ছাড়া জান্নাতে আর কোনো মনোবেদনা থাকবে না। দুনিয়াতে যে সময়টুকু তারা আল্লাহকে স্মরণ করেনি ঐ সময়ের আফসোস করতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা সিজদা অবস্থায় স্বীয় রবের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়।

আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হলো নামায। বান্দা নিবিষ্টচিত্তে তার রবের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে যা আল্লাহ তা'আলা খুবই পছন্দ করেন। বান্দা তার রবের কাছে সরাসরি তার মনের যত আবেদন পেশ করতে পারে। মুমিনদের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে নামাযের কথা বলা হয়েছে।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

মুমিন তো তারাই, (যাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হলে তাদের হৃদয় ভীত হয় এবং যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দেয় এবং তারা তাদের রবেরই উপর ভরসা করে। যারা নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারাই সত্যিকার মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বহু মর্যাদা, ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক। [সূরা আনফাল: ২-8]

এখানে সত্যিকার মুমিনদের গুণাবলি কী তা আলোচনা করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা নামায কায়েম করে। এ থেকে বোঝা গেল সত্যিকার মুমিন হতে হলে নামায আদায় করতে হবে। নামায ছাড়া সত্যিকার মুমিন হওয়া যাবে না।

আল্লাহ আরো ইরশাদ করেন-

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِہِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ
لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ
هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوٰرِثُوْنَ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ- যারা তাদের নামাযে বিনীত, যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত আদায়কারী, যারা নিজ লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তবে নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাধীন দাসীদের থেকে নয়, কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী এবং যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা নিজেদের নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। তারাই উত্তরাধিকার লাভকারী, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। [সূরা মুমিনুন: ১-১১]

এ আয়াতে সফল মুমিনদের গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাদের একটি গুণ হল তারা তাদের নামাযে বিনীত (خٰشِعُوْنَ)।
এ শব্দটি خُشُوْع থেকে নির্গত। خُشُوْع শব্দের অর্থ হচ্ছে বিনয়। কখনো ভয়, প্রশান্তি ও স্থিরতার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আসলে এ বিষয়গুলো কাছাকাছি।

خُشُوْع কুরআনে একাধিক স্থানে অন্তরের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশেষণরূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আয়াতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, সফল মুমিন তারা, যারা নামাযে পরিপূর্ণরূপে বিনীত, আন্তরিকভাবেও এবং শারীরিকভাবেও। তাদের বিনয় অন্তর-জগৎকে ছাড়িয়ে দেহ-জগৎকে প্লাবিত করে। তাদের বিনয় ভেতর থেকে পরিস্ফুট হয়ে বহিরঙ্গকে আলোকিত করে।

বিনয় মানে কী আমরা সবাই জানি- নিজেকে ছোট মনে করা। তো বিনয়ের সঙ্গে নামায পড়ার অর্থ হল নিজেকে ছোট, দুর্বল, অসহায় ও মুখাপেক্ষী মনে করে আর আল্লাহকে সবচেয়ে বড় মনে করে সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর সম্মুখে নিজের বন্দেগী নিবেদন করা। বলার অপেক্ষা রাখে না, এর জন্য দেহমনের উপস্থিতির বিকল্প নেই।

এই খুশূ-ই হচ্ছে নামাযের রূহ। আসলে খুশূ মুমিনের সবসময়কার অবস্থা। এখানে বিশেষভাবে নামাযের কথা বলা হয়েছে এজন্য যে, নামায হচ্ছে খুশূর প্রকাশের সর্বোত্তম জায়গা।

সফল মুমিনদের দ্বিতীয় গুণ হল তারা তাদের নামাযমূহের প্রতি যত্নবান থাকে। এই যত্নের মধ্যে সময়মত নামায পড়া, নিয়মিত নামায পড়া এবং নিয়মনীতি, হক ও আদবসমূহ লক্ষ করে নামায পড়া সবই শামিল।

অপর সূরায় আল্লাহ নামাযীদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেছেন-

الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ اُولٰٓئِكَ فِيْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ

যারা তাদের নামায আদায় করে নিয়মিত। এবং যাদের সম্পদে আছে নির্ধারিত হক, যাচক ও বঞ্চিতের জন্য। এবং যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস রাখে এবং যারা তাদের রবের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত। নিশ্চয় তাদের রবের শাস্তি এমন নয় যে, তা থেকে নির্ভয় থাকা যায়। এবং যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তাদের স্ত্রী বা তাদের মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া। কেননা (এ ক্ষেত্রে) তারা নিন্দনীয় নয়। আর যারা এ ছাড়া (অন্য পথ) অন্বেষণ করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং যারা আপন সাক্ষ্য যথাযথভাবে প্রদান করে। এবং যারা তাদের নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে। তারা জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে। [সূরা মাআরিজ: ২৩-৩৫]

এখান থেকে আমরা প্রকৃত নামাযীর পরিচয় জানতে পারলাম। প্রকৃত নামাযী হচ্ছে যার মধ্যে উপরিউক্ত গুণাবলি বিরাজমান থাকে, যেগুলোর শীর্ষে রয়েছে নিয়মিত নামায পড়া এবং যত্নের সাথে নামায পড়া।

সূরা মুমিনুনে উল্লেখিত সফল মুমিনের সাতটি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সম্পর্কিত। এমনিভাবে সূরা মাআরিজে উল্লেখিত নামাযীর নয়টি গুণের মধ্যে দুটি গুণই হচ্ছে নামায সংক্রান্ত এবং উভয় সূরায় গুণগুলোর আলোচনা শুরু হয়েছে নামায দিয়ে এবং শেষও হয়েছে নামায দিয়েই। এ থেকে অনুমেয়, নামায কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঈমানের সাথে এর অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।